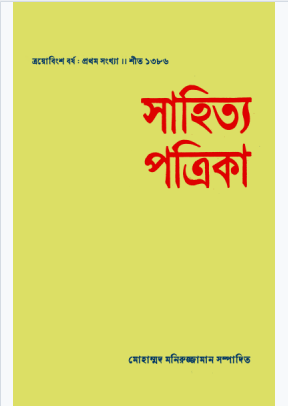

Vol. 23 | No. 1 | 1979

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বাউল মতবাদের পটভূমি

Volume	23
Issue	1
Year	1979
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	এস. এম. লুৎফর রহমান
Published online	December 1, 1979
DOI	10.62328/sp.v23i1.7
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v23i1.7
Pages	128-153
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

বাউল মতবাদের পটভূমি

এস. এম. লুৎফর রহ্‌মান

বাউল-সাধনা বাঙ্‌লার এক বিস্ময়কর ধর্ম-সাধনা। বাঙ্‌লা দেশের দু'টি প্রধান ধর্ম-সম্প্রদায়—হিন্দু ও মুসলমান-সমাজের নিম্নতম স্তরের উচ্ছন্ন-সর্বহারাদের একাংশই—বাউল। ব্রিটিশ আমলের সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ, ওয়াহাবী আন্দোলন, ফরায়েজী আন্দোলন প্রভৃতির সঙ্গে তাঁদের কোন সংযোগ ছিল বলে প্রমাণ নেই। অর্থনৈতিক দিক থেকে বাউলধর্মের বিধান অনুযায়ী-ই বাউলেরা ভিক্ষাজীবী। এ ক্ষেত্রে তারা মঠবাসী ভিক্ষুদের সঙ্গে অনায়াসে তুলনীয়। সামাজিক জীবনে সর্বপ্রকার কর্তৃত্ব, খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার প্রতি—বাউলেরা বিগতস্পৃহ। পোষাক-পরিচ্ছদ, আচার-ব্যবহারেও তাঁরা 'জীয়ন্তে মৃতে'র জীবন্ত প্রতিভূ।

বাউলদের ধর্মমতের মধ্যে আদিম-চেতনার সঙ্গে আধুনিক চেতনার সংমিশ্রণ বিদ্যমান। তার অধিকাংশই আদি মানব-সমাজের বস্তুবাদী ধ্যান-ধারণায় নিবদ্ধ, আর অল্পই হ'ল উদার মানবিক আধুনিক অনুভূতি। ভাবতে আশ্চর্য লাগে, কেমন ক'রে—অতি আদিম মানব-সমাজে উদ্ভূত, নারীর ঋতু-রক্ত, শক্তি এবং প্রকৃতি পূজায় সংমিশ্রিত আদি সাংখ্য, যোগ-তন্ত্রের মিথুনাত্মক সাধনা এ বিংশ শতাব্দীতেও বাঙালী সমাজের নিম্নকোটিতে জীবন্ত বর্তমান।

সুপ্রাচীন কাল থেকে আজ পর্যন্ত কৃষিপ্রধান অর্থনীতি-নির্ভর বাঙ্‌লা দেশে বাউলেরা মাতৃতান্ত্রিক যোগ-তন্ত্রসম্মত দেহ-সাধনায় একান্তনিষ্ঠ। সামন্ততান্ত্রিক সমাজের নিম্নতম স্তরে সুদীর্ঘকালব্যাপী তাঁদের প্রাগৈতিহাসিক লোকায়ত চিন্তাধারা কিভাবে অব্যাহত শ্রেণীগত নিষ্পেষণের মুখে—'বালুকায় মাথা গুঁজে' বেঁচে থেকে, ক্রমবিকাশ অন্তে, এখন বিলুপ্ত প্রায়—পরবর্তী আলোচনায় তার লুপ্ত ইতিহাস অন্বেষণ করা হবে। আলোচ্য ইতিকথা শুধু বাউলদের ধর্মমতের উৎপত্তিনির্দেশ ও বাউল-সাধনার ফিরিস্তিপূর্ণ উপকরণ সঞ্চয় নয়—বাঙ্‌লার প্রাচীন ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে কেমনভাবে ও কিসের উপর ভিত্তি ক'রে—এমতবাদ ধীরে ধীরে কখন উদ্‌গত হ'য়েছে এবং তার বৈশিষ্ট্যই বা কি—তা'ও অনুসন্ধেয়।

দেশ ও জাতি-পরিচয়

বাঙ্‌লা দেশ ও বাঙালী জাতির যে প্রাচীন ইতিহাসের উপর বাউলমতবাদের মূল কাঠামো স্থাপিত, তা' আজও অনালোকিত। এদেশের পুরাতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিক অনুসন্ধান বিশেষ অগ্রগতি লাভ করেনি।[১] বাঙ্‌লার জনতত্ত্ব সম্পর্কেও কোন নিশ্চিত বিবরণ লাভ করা প্রায় অসম্ভব।

---

১ দ্রষ্টব্য: ক. রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, প্রা. যু., প্র. খ., (জেনারেল প্রিন্টার্স এণ্ড পাব্‌লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড্-প্রকাশিত, প. প. সং., কলি.—১৩৭৭), পৃ. ১২-১৪। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। "বাঙালী জাতির উৎপত্তি।"

খ. রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঙ্গালার ইতিহাস, প্র. ভা., (গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-প্রকাশিত, দ্বি. সং., কলি.—১৩৩০), পৃ. ১–১২। প্রথম পরিচ্ছেদ। "প্রাগৈতিহাসিক যুগ"।

সর্বভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে, স্যার হার্বার্ট রিজ্‌লী, রমাপ্রসাদ চন্দ, ডঃ বি. এস. গুহ, এইচ. সি. চাকলাদার, নীহাররঞ্জন রায়, ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র মজুমদার, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ নৃতত্ত্ব-ভাষাতত্ত্ব-ইতিহাসবিদের আলোচনা থেকে বাঙলার প্রাচীন জনধারার যেটুকু পরিচয়, মোটামুটিভাবে, প্রায় সর্বজন-স্বীকৃত, তা' হ'ল—বাঙালী জনসৌধের প্রথম স্তর নেগ্রিটো বা নিগ্রোবটুদের দ্বারা গঠিত।[২] তাদের স্পষ্ট কোন নিদর্শন এখন আর পাওয়া যায় না। পরবর্তীকালে যে জনধারার চাপে নিগ্রোবটুদের বিলোপ ঘটে—তার নাম দীর্ঘমুণ্ড আদি-অস্ট্রেলীয় (ভেড্‌ডিড বা নিষাদ)। নীহাররঞ্জন রায়ের অভিমত—"বাঙালীর জনপ্রকৃতিতে এপর্যন্ত যেসব উপাদান পাওয়া গিয়াছে তাহাতে বলা যায়, ভেড্‌ডীয় উপাদানই বাংলার জনগঠনের মূল ও প্রধান উপাদান। পরে কালক্রমে নানা অবস্থায় তাহাতে কমবেশী মাত্রায় পশ্চিমে ইন্দো-আর্য ও শক-পামিরীয় উপাদান এবং পূর্বে মঙ্গোলীয় প্যারোইয়ান ও মালয়-ইন্দোনেশীয় উপাদান আসিয়া মিশিয়াছে। মোটামুটিভাবে ইহাই বাংলা ভাষাভাষী জনসৌধের চেহারা এবং এই জনসৌধের উপরই বাঙালীর ইতিহাস গড়িয়া উঠিয়াছে।"[৩] ঐতিহাসিক-বিবেচনায় এসব বিচিত্র জনসত্তার মধ্যে "The Alpine race which succeeded the Nishadas and forms the main element in the composition of the present Bengalis, ---- possessed a higher degree of civilisation."[৪] এ গোল-মুণ্ড ভূমধ্য-অ্যালপাইনীয় দ্রাবিড়ভাষী গ্রাত্যদের সঙ্গে পরবর্তীকালে ইন্দো-আর্যের সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণের মাধ্যমে ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে 'খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ থেকে খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের মধ্যে জৈন, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ছাঁচে ফেলে আদি বাঙালী জাতির উদ্ভব হয়।'[৫] অর্থাৎ বাঙলার অধিবাসীরা এ সময়ের মধ্যে, আর্যভাষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির মাধ্যমে, আদিম কৃষিজীবী অস্ট্রিক ভাষাভাষীদের সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক উপাদান—ক্ষেত্রবিশেষে আত্মসাৎ, বিলোপ কিংবা বিধ্বস্ত ক'রে—একটি সুস্পষ্ট বাঙালী মানস-গঠনে সমর্থ হয়। সাংখ্য, যোগ-তন্ত্র-সমৃদ্ধ জৈন ও বৌদ্ধধর্ম দ্বারাই—জাতি হিসেবে বাঙালীর উক্ত মানস-বৈশিষ্ট্যের প্রথম পরিচয়।

বাঙলার প্রাচীনতম ধর্ম

বাঙলার পূর্বোক্ত জনতত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতে, এখনকার জনসমাজের অতি নিম্নস্তরে প্রচলিত নানা রকম যাদুবিশ্বাস, স্ত্রী-আচার, ব্রত, সংস্কার, বিশ্বাস, গ্রাম্য দেব-দেবতার পূজা, মানত প্রভৃতিতে অস্ট্রো-দ্রাবিড়ীয় ভাষাভাষী মানুষের ধ্যান-ধারণার, অসম্ভব প্রাচীন প্রবাহের, তাৎপর্যপূর্ণ নিদর্শন পাওয়া যায়। নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন—"বাঙালীর ইতিহাসের আদি পর্বে---বাঙালীর ধর্মকর্মের গোড়াকার ইতিহাস হইতেছে

---

২ দ্রষ্টব্য: ক. H, H. Risely, *The Tribes and Castes of Bengal*, Vol. I,. (Secretariat Press, Cal. 1891), PP. XXXi—XXXIV. Introduction.

খ. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়; জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য (মিত্র এণ্ড ঘোষ-প্রকাশিত, কলি.----১৩৪৫), পৃ. ১৩।

গ. নীহাররঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস, আদি পর্ব, (লেখক-সমবায়-সমিতি-প্রকাশিত, সংক্ষেপিত সংস্করণ, কলি. ---১৩৭৭), পৃ. ১২। দ্বিতীয় অধ্যায়। "ইতিহাসের গোড়ার কথা।"

৩ নীহাররঞ্জন রায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯। দ্বি. অ., ঐ।

৪ R, C. Mojumdar, *ed. The History of Bengal*, Vol. I, (D. U. Second Impression, Dacca—1963), P. 562. Ched. XV," Ethnological Background."

৫ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা, (ক. বি., পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ ---১৯৩৬), পৃ. ৫৩-৫৪। "বাঙ্গলা ভাষা ও বাঙ্গালী জাতির গোড়ার কথা"।

রাঢ়পুণ্ড্র-বঙ্গ প্রভৃতি বিভিন্ন জনপদগুলির অসংখ্য জন ও কোমের, এক কথায় বাংলার আদিবাসীদেরই পূজা, আচার, অনুষ্ঠান, ভয়, বিশ্বাস, সংস্কার প্রভৃতির ইতিহাস। এ তথ্য সর্বজন স্বীকৃত যে, আর্য-ব্রাহ্মণ্য বা বৌদ্ধ, জৈন ইত্যাদি সম্প্রদায়ের ধর্ম-কর্ম, শ্রাদ্ধ, বিবাহ, জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতি সংক্রান্ত বিশ্বাস, সংস্কার ও আচারানুষ্ঠান, নানা দেব-দেবীর রূপ ও কল্পনা, আহার-বিহারের ছোঁয়াছুঁয়ি অনেক কিছুই আমরা সেই আদিবাসীদের নিকট হইতে আত্মসাৎ করিয়াছি।"[৬] বর্তমান বাঙালী হিন্দু সমাজে প্রচলিত নানাবিধ গ্রাম্য দেব-দেবতার পূজা, ক্ষেত্রপালের পূজা, ধ্বজা পূজা ও বরণ-ব্রতাদির প্রতি আলোকপাত করতে গিয়ে তিনি আরও বলেছেন—"সাংস্কৃতিক জনতত্ত্বের আলোচনায় ক্রমশ এই তথ্যই সুস্পষ্ট হইতেছে যে, আমাদের গ্রাম্য সমাজে বিশেষভাবে নারীদের ভিতর, যে সব ব্রত আজও প্রচলিত তাহার অধিকাংশই অবৈদিক, অস্মার্ত, অপৌরাণিক ও অব্রাহ্মণ্য এবং মূলত গুহ্য যাদু ও প্রজনন শক্তির পূজা, যে-পূজা গ্রাম্য কৃষি সমাজের সঙ্গে একান্ত সংপৃক্ত।"[৭] উল্লেখযোগ্য যে, বাঙলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামেই সমগ্রোত্রীয় ব্রতধর্ম ও স্ত্রী-আচারের প্রসার অধিক এবং সেগুলো একমাত্র মেয়েদের-ই অধিকার ভুক্ত, লেখক সে-তথ্যের প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রেছেন। নীহাররঞ্জন রায় 'অগণিত এসব ব্রতে'র মধ্যে বারো মাসে আচরিত যে একত্রিশটি ব্রতের বিবরণ দিয়েছেন—তার মধ্যে গুহ্য যাদু ও প্রজননশক্তির পূজাই সর্বাধিক। আর এই প্রজনন শক্তি নিয়ন্ত্রণ-ই বাউল মতবাদেরও গোড়ার কথা। বাউলধর্মের ইতিহাস অনুসন্ধান করতে শেষোক্ত তথ্যটি বিশেষ মূল্যবান। কেননা, প্রাচীন মানব-সমাজে প্রথম উদ্ভূত প্রজনন-তান্ত্রিক ধর্মবিশ্বাসের প্রাথমিক রূপের পরিচয় গ্রহণ ব্যতীত—বাউলদের কতিপয় আচার-আচরণ ও বিশ্বাস—নোংরা, কদর্য ও বীভৎস ব'লে প্রতিভাত হওয়া বিচিত্র নয় এবং সেজন্য তাদের ধ্যান-ধারণা ও সাধন-ভজনের প্রকৃত মর্ম উপলব্ধিতে ব্যাঘাত সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক।

প্রজননতান্ত্রিক যাদুবিশ্বাস ও অনুষ্ঠান

কৃষিজ-সভ্যতার ঊষাকালে, আদিম কমিউন-পরবর্তী মাতৃতান্ত্রিক সমাজে, উৎপাদন ক্ষেত্রে নারীর প্রাধান্য লাভের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মেও তার অধিকার এবং শক্তি স্বীকৃত হয়। তখন মাতা ও ভূমিকে অভিন্ন মর্যাদা দেওয়া হ'ত। বিশ্বাস করা হ'ত, রজস্বলা হবার পর রজঃ রোধ হ'য়ে নারী যেমন গর্ভবতী হয় এবং সন্তান জন্মদান করে, তেমনি বৃষ্টিধারায় সিক্ত হ'য়ে ভূমিও ফলবান হয় এবং শস্য উৎপাদন করে। ফলে, নারীর প্রজনন শক্তির অধীনে যাদুবিশ্বাস ও লিঙ্গপূজার অঙ্গ হিসেবে অর্চনা করা হ'ত প্রকৃতিকে। আদিম সমাজে, ধর্মের এরূপ উৎপত্তির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে রাহুল সাংকৃত্যায়ন ব'লেছেন—"ধর্ম বিষয়ে মানুষের দৃষ্টি সর্বপ্রথম রুধির ও যৌন সম্বন্ধের দিকে আকৃষ্ট হয়।---দৈব শক্তির নিকট হইতে শুভ লাভ ও ভয় শান্তির আশায় রুধিরদান সর্বপ্রথম ধার্মিককৃত্যে পরিণত হয়।---দৈবী শক্তির সন্তুষ্টির জন্য জননাঙ্গের রুধির-দানই তাহাদের নিকট বেশী উপযোগী বলিয়া মনে হয়।"[৮] এরূপে ধর্মে, সমাজে ও উৎপাদন ক্ষেত্রে নারীর সার্বভৌম আত্মপ্রতিষ্ঠার দরুণ তার প্রজননশক্তির বিকাশ স্বরূপ ঋতু ও 'লোকিয়া' স্রাবও, সে যুগে জীবনচর্যার কেন্দ্রীয়কোষ রূপে

---

৬ নীহাররঞ্জন রায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৫। দ্বাদশ অধ্যায়। "ধর্মকর্ম : ধ্যান-ধারণা", দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ।

৭ নীহাররঞ্জন রায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৮--৯৯। দ্বাদশ অধ্যায়। "ধর্মকর্ম : ধ্যানধারণা-দুই"।

৮ রাহুল সাংকৃত্যায়ন, মানব-সমাজ, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড একত্রে, ('ভারতী বুক ষ্টল'-প্রকাশিত, সুবোধ চৌধুরী অনূদিত, নতুন সংস্করণ, কলি,---১৩৬৮), পৃ. ৫৮। তৃতীয় অধ্যায়। "বর্বর মানব সমাজ, ধর্ম"।

বিবেচিত হয়। জর্জ টমসন ব'লেছেন—"---পুরুষপ্রধান সমাজে ধর্মাচরণের উপর মেয়েদের অধিকার লুপ্ত হবার পর এই যাদুবিশ্বাসের নেতিমূলক দিকটির-ই জয় হয়; ঋতুমতী নারী শুধুমাত্র কলুষিত বলেই বিবেচিত হয়।"[৯]

নারীপ্রধান ধর্ম ও সমাজের উক্ত বিশেষ বৈশিষ্ট্যের পরিচয় সিন্ধু-উপত্যকার বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্যের মধ্যে পাওয়া যায়। রাহুল লিখেছেন—"পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে সিন্ধু উপত্যকাবাসীরা ভগ ও লিঙ্গ পূজাকে আপন ধর্মের অঙ্গ বলিয়া মনে করিত; হরপ্পা এবং মোহেনজোদাড়োর খননে স্ত্রী-পুরুষের জননাঙ্গের অনেক প্রস্তর প্রতিমা পাওয়া গিয়াছে।"[১০] শুধু তাই নয়, স্যার জন মার্শাল হরপ্পায় প্রাপ্ত একটি আশ্চর্য 'সীলমোহরে'র প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রেছেন। তার এক পিঠে একটি নগ্ন নারী-মূর্তি। দু'পা' প্রসারিত ক'রে দাঁড়ানো। যৌনাঙ্গ থেকে উদ্ভূত হ'চ্ছে একটি লতা। যেন বিশ্বপ্রকৃতির জন্ম হচ্ছে নারীর কুক্ষি থেকে। সীলমোহরটি মাতৃতান্ত্রিক কৃষিজ সমাজের ধর্মবিশ্বাসের বিশেষ প্রতীক। 'সীলে'ধৃত চিত্র—দেবীচিত্র এবং তিনি কৃষির অধিষ্ঠাত্রী। কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রে'—বীজ-বপন-মন্ত্র প্রসঙ্গে 'সীতা' নামক যে কৃষিদেবীর উল্লেখ বিদ্যমান,[১১] আলোচ্য দেবী হয়তো তার-ই আদি রূপ। দ্রাবিড় ভাষায় সিন্ধু-উপত্যকার অধিবাসীরা তাকে বলতেন 'অম্মা' বা 'মা'। মার্কণ্ডেয় পুরাণের "আত্মদেহ সমুদ্ভবৈঃ শাকম্ভরী"---অন্নদা; অন্নপূর্ণা, দেবী দুর্গার সঙ্গে তার পার্থক্য সামান্যই। এ-সমাজে দেবী 'অম্মার' পাশাপাশি দেবতা 'আন্'-এরও যোগ-ধ্যানরত মূর্তি আবিষ্কৃত হ'য়েছে। স্যার জন মার্শাল, আর. ই. মার্টিমার হুইলার প্রমুখ তাকে শিবের সঙ্গে অভিন্ন ভেবেছেন।[১২] 'আন্' যে শিবের-ই পূর্ব রূপ—তা' স্বীকার্য। কিন্তু সমাজে উৎপাদন ব্যবস্থায় পুরুষ অপেক্ষা নারীর প্রাধান্য থাকায় ধর্মেও শিব অপেক্ষা শক্তিই ছিলেন প্রধান।

বস্তুতঃ কৃষিজীবী আদিবাসীদের ধর্মে—জননাঙ্গের রুধির দান, মৈথুন ও নারীর সার্বভৌম আধিপত্য—উৎপাদন-ব্যবস্থার নতুন রীতির (কৃষির) সঙ্গে খাপ খাইয়ে ধীরে ধীরে বিকশিত হ'য়ে ওঠে। এ সম্পর্কে রবার্ট ব্রিফল্ট লিখেছেন—"The assimilation of the fruit-bearing soil to the child-bearing women is universal---the fecundity of the earth and the fecundity of women are viewed as being one and the same quality."[১৩] এরূপে 'শক্তি' এবং বসুমতী, সন্তান ও শস্যের আধার রূপে বিবেচিত হওয়ায়—মৈথুন বা নির্বিচার 'শক্তি-সঙ্গম',[১৪] সেকালে

---

৯ উদ্ধৃত ও অনূদিত, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, লোকায়ত-দর্শন, দ্বিতীয় খণ্ড, (নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট মিলিটেড্-প্রকাশিত, কলি--১৩৬৩), পৃ. ৩৩৮। দ্বিতীয় খণ্ড, তৃতীয় পরিচ্ছেদ। "বার্তাশস্ত্রোপজীবী পর্যায়ে গণপতির রূপ"।

১০ রাহুল সাংকৃত্যায়ন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৯। তৃতীয় অধ্যায়, "বর্বর মানব সমাজ, ধর্ম"।

১১ See, *Kautilya's Arthasastra*. Translated by Dr. R. Shamasastry, (Second Edition, Mysore—1923). P. 141. Ch. XXIV, Art. No. 118.

১২ ডঃ আর. ই. মার্টিমার হুইলার, শেখ মোহাম্মদ ইক্‌রাম-সম্পাদিত, পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার, (পাকিস্তান পাব্‌লিকেশান্‌স-প্রকাশিত, দ্বি. সং., ঢাকা---১৯৬৬), পৃ. ৫৯। পাকিস্তানের প্রত্নতত্ত্ব, "সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা" দ্রষ্টব্য।

১৩ উদ্ধৃত, ডঃ আহ্‌মদ শরীফ, স্বদেশ অন্বেষা, (খান ব্রাদার্স এণ্ড কোং-প্রকাশিত, ঢাকা---১৩৭৭) পৃ. ১২৩। "বাউল তত্ত্ব"।

১৪ দ্রষ্টব্য: ডঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য কর্তৃক উদ্ধৃত ও আলোচিত ছান্দোগ্য উপনিষদের "বামদেব্য সামোপাসনা"। বাংলার বাউল ও বাউল গান, প্র. খ., (ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি-প্রকাশিত, দ্বি. সং., কলি. ---১৩৭৮), পৃ. ১৭৬। দ্বিতীয় অধ্যায়, "বাংলায় ধর্মের ক্রম বিবর্তনে বাউল ধর্মের উৎপত্তি ও স্থান"।

অপেক্ষাকৃত উন্নত সমাজেও পুণ্যকর্ম রূপে এবং রেতঃ (বারি) সৃষ্টির অন্যতম কারণ হিসেবে 'ব্রহ্ম' বা 'আত্মা' নামে অভিহিত হয়। আর্যদের বৈদিক যুগের রচনাবলীতে তার প্রমাণ বিদ্যমান। ছান্দোগ্য উপনিষদের ৫।৭।১ শ্লোকে স্ত্রীলোককে বলা হ'য়েছে—'অগ্নি,' তার উপস্থ—'সমিধ', রতিসম্ভাষণ—'ধূম', যোনি—'অগ্নিশিখা', অঙ্গ-সংযোগ—'অঙ্গার', রতিক্রিয়া—'স্ফুলিঙ্গ'। মৈথুন ও যজ্ঞকর্মের এ অভিন্নত্ব বৃহদারণ্যক উপনিষদেও লক্ষণীয়। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য লিখেছেন—"যজ্ঞক্রিয়া-রূপ ধর্মানুষ্ঠানের দ্বারা যে ফললাভ হয়, সেইরূপ মৈথুন-ক্রিয়াতেও যজ্ঞানুষ্ঠানের তুল্য ফললাভ হয়।" অতঃপর তিনি ঐ উপনিষদের একটি শ্লোকের শাঙ্করভাষ্যসম্মত অনুবাদ উদ্ধৃত ক'রেছেন। তাতে বলা হ'য়েছে—'স্ত্রীর উপস্থটিকে (জননেন্দ্রিয়কে) 'বেদী', লোমসমূহকে—'কুশ', চর্মকে—'চর্ম', মুকদ্বয়-(বৃহদৌষ্ঠদ্বয়) কে—অধিষবণদ্বয় বা সোমপেষণের দু'টি প্রস্তর খণ্ড ব'লে চিন্তা ক'রবে। যজমান (যাজ্ঞিক পুরুষ) বাজপেয় যাগের দ্বারা যে-পরিমাণ লোক বা ফলপ্রাপ্ত হয়, যথোক্ত প্রকার বিজ্ঞান-সম্পন্ন পুরুষেরও সেইরূপ ফললাভ হয়। [অতএব এবিষয়ে ঘৃণা বা কুৎসা নিষিদ্ধ]।'[১৫] মৈথুনের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃই বৃহদারণ্যক, ঐতরেয় প্রভৃতি উপনিষদে রেতঃ;—অমৃত, আত্মা, ব্রহ্ম ইত্যাদি রূপে ব্যাখ্যাত। ঐতরেয় উপনিষদে স্পষ্ট বলা হয়েছে—'রেতঃ সমুদয় অঙ্গ থেকে সংগৃহীত তেজ, ঐ রেতঃ রূপ আত্মাকে পুরুষ স্বশরীরে ধারণ করে।'[১৬] উল্লেখ্য, বেদ ও উপনিষদীয় যুগের আবির্ভাবের অনেক আগেই, আদিম অনার্য কৌম সমাজের মানুষ—নারী, মৈথুন, রেতঃ ও রজের প্রতি, এরূপ বিস্ময়কর শ্রদ্ধা এবং লোকায়ত, পবিত্র মনোভাব দেখিয়েছিল। আর 'লিঙ্গ-পূজা' ও 'শক্তি-পূজার' মাধ্যমে তারা বস্তুতঃ বীজেশ্বরবাদী 'দেহাত্মবাদ'কেই প্রতিষ্ঠিত ক'রেছিল। বর্তমান প্রসঙ্গে এ তথ্য বিশেষভাবে আলোচনার কারণ এই যে, উক্ত বীজেশ্বরবাদী দেহাত্মবাদ তার সমস্ত পূর্বালোচিত আদিম উপাদান, প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যসহ আধুনিক বাউলমতবাদের মধ্যেও জীবন্ত ভাবে বর্তমান। অবিশ্বাস্য প্রায়, এ ঘটনার কার্যকারণ ব্যাখ্যায় শুধু একথা বলাই যথেষ্ট নয় যে, আমাদের দেশে আদিম কৃষিজ অর্থনীতি ও উৎপাদন ব্যবস্থার ধারাপ্রবাহেই, চিন্তায় ও কর্মে সর্বাধিক অনগ্রসর বাউলগণ উক্ত লোকায়ত ধ্যান-ধারণার উত্তরাধিকারী। সেই সঙ্গে আরও বলা আবশ্যক যে, বাঙলা দেশে তো বটেই, এমন কি—সমগ্র উপ-মহাদেশীয় পরিপ্রেক্ষিতেই আদিম মানুষের সমাজ ও ধর্ম-বিবর্তন ধারায় প্রজনন-শক্তি কেন্দ্রিক যাদুবিশ্বাস ও অনুষ্ঠান বিশেষতঃ 'লিঙ্গ-পূজা' ও 'শক্তি-পূজা'র পাশাপাশি সাংখ্য-যোগ-তন্ত্রের ক্রমবিকাশও এর অন্যতম কারণ।

সাংখ্য-যোগ-তন্ত্র

পণ্ডিতগণের অভিমত অনুযায়ী, অধ্যাত্ম-অর্থে, 'জ্ঞানযোগ' ও 'কর্মযোগ'-এর অপর নাম 'সাংখ্য মত' ও 'যোগমত'।[১৭] জ্ঞান, কর্ম ও প্রজনন—মানব-সমাজে ধর্মের আদি উৎপত্তির সঙ্গে জড়িত থাকায়, ঐ তিনটি থেকে উদ্ভূত সাংখ্য, যোগ ও তন্ত্রের আদি ইতিহাস অনির্ণেয়। জিমার ব'লেছেন—"সাংখ্য আর যোগের মূল ধারণাগুলি অসম্ভব পুরোণো।"[১৮] শুধু সাংখ্য-যোগ নয়, তন্ত্রও অতি প্রাচীন সাধন-পদ্ধতি এবং "pagan

---

১৫ দ্রষ্টব্য: উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৫--৭৬। দ্বিতীয় অধ্যায়, "বাংলায় ধর্মের ক্রম-বিবর্তনে বাউল ধর্মের উৎপত্তি ও স্থান।"

১৬ দ্রষ্টব্য: উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৭। দ্বিতীয় অধ্যায়, ঐ।

১৭ See, Bhagabat Kumar Goswami Shastri. *The Bhakti Cult in Ancient India*, (B. Banarjee & Co., Cal.—1922), P. 37. Ch. V, "Yoga & Samkha."

১৮ উদ্ধৃত ও অনূদিত, দেবী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, প্র. খ., পৃ. ৫১৭। দ্বিতীয় খণ্ড, গণপতি: "সাংখ্য-দর্শনের উৎস"।

যুগের যাদুবিশ্বাস ও টোটেম স্তরের মৈথুনতত্ত্ব থেকে'' উদ্ভূত।[১৯] 'তন্ত্র' সম্পর্কে আলোচনা কালে চিন্তাহরণ চক্রবর্তী ব'লেছেন—''বৈদিক সাহিত্যের প্রাচীনতম অংশেও তান্ত্রিকতার পূর্ব রূপ নিঃসন্দিগ্ধ রূপেই পাওয়া যায়।''[২০] একারণেই পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিমত—''তন্ত্র অতি প্রাচীন, তন্ত্র ধর্মই বাঙলার আদিম ধর্ম এবং ইহা অবৈদিক ও অনার্য।''[২১] বস্তুতঃ আদিম কৌম সমাজে নারী ও ভূমি এবং প্রজনন-পদ্ধতি ও কৃষিকর্মের সাধর্ম্যের মধ্যেই ধীরে ধীরে পুরুষ-প্রকৃতি কেন্দ্রিক সাংখ্য-যোগ-তন্ত্রের বিকাশ ঘটে। সমাজও এগিয়ে আসে কৌম থেকে জনপদে। প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য থেকে, সিন্ধু-উপত্যকার বিভিন্ন স্থানে এরূপ 'এগিয়ে আসা জনপদের'-ই পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু পরবর্তীকালে, আর্য-অনার্যের সংমিশ্রণের পর সমাজ যখন মাতৃ-থেকে পিতৃ-সত্তায় রূপান্তর লাভ ক'রতে থাকে, তখন এসব মতের প্রাচীন রূপটির ও ক্রমশঃ বদল হয়।

'সাংখ্য' সম্পর্কে আলোচনাকালে বিজ্ঞানভিক্ষু 'বিজ্ঞানামৃতভাষ্যে' ব'লেছেন—'আদি সাংখ্য নাস্তিক ছিল না।'[২২] একথা গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, চতুর্দশ শতকে গুণরত্ন সাংখ্য-শাস্ত্রকে দু'ভাগে বিভক্ত ক'রেছেন—'মৌলিক সাংখ্য' ও 'উত্তর সাংখ্য'।[২৩] দু'য়ের মধ্যে 'মৌলিক সাংখ্য' কপিল, পঞ্চশিখ, চরক প্রভৃতির রচনায় আলোচিত হয়েছে; এবং কপিল ঈশ্বরকে স্বীকার করেননি। তাঁর 'তত্ত্বসমাসে' ঈশ্বর-প্রসঙ্গ অনুপস্থিত। 'মহাভারতে'ও যোগ এবং সাংখ্যের পার্থক্য নির্দেশ ক'রতে গিয়ে বলা হ'য়েছে—'সাংখ্য নিরীশ্বরবাদী আর যোগ ঈশ্বরবাদী।'[২৪] অর্থাৎ যোগের ন্যায় সাংখ্যমত তখনও সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়নি। তাই দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন—''নিজস্ব মৌলিক তত্ত্বগুলি বিসর্জন দেবার পরই সাংখ্য দর্শন আস্তিক ব'লে স্বীকৃত হ'য়েছে; অর্থাৎ আদি সাংখ্য ও আস্তিক সাংখ্য মোটেই এক নয়।''[২৫] যোগ-তন্ত্র সম্পর্কেও এক-ই কথা প্রযোজ্য।

ঈশ্বরহীনতাই আদি সাংখ্যের একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়। যে পুরুষ-প্রকৃতি তত্ত্ব সাংখ্য-দর্শনের মূল ভিত্তি, তারও প্রাচীনতম রূপ প্রাক্-অধ্যাত্মবাদী ছিল। এ সম্পর্কে দেবী-প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের অভিমত—''সাংখ্য-দর্শনের আদি-রূপ অনুসারে পুরুষ ব'লতে আত্মা বা Soul বোঝায়নি। কালক্রমে অবশ্যই সাংখ্যের পুরুষ আত্মাবাচক হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল; ...আদি-পর্বে সাংখ্যের ওই পুরুষ ব'লতে আত্মা বোঝাতো না—তার বদলে পুরুষ মানুষই বোঝাত।''[২৬] অনুরূপভাবে 'প্রকৃতি' ব'লতেও বোঝাত—নারী। অধ্যাপক বেলভেকার ও রাণাডেও এদিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রেছেন।

---

১৯ আহ্‌মদ শরীফ, বাঙলার সূফী সাহিত্য, (বা. এ., ঢাকা--১৯৬৯), পৃ. আ। ভূমিকা, ''বাঙলার সূফী-সাধনা ও সূফী-সাহিত্য।''

২০ চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, নরেন্দ্রনাথ লাহা ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত, হরপ্রসাদ-সংবর্দ্ধন-লেখ-মালা, (প্র. খ., ব. সা. প. প্রকাশিত, কলি.--১৩৩৮) পৃ. ৭৪। ''তন্ত্রের প্রাচীনতা ও প্রামাণ্য''।

২১ উদ্ধৃত, আহ্‌মদ শরীফ, স্ব. অ., পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৮। ''বাউল-তত্ত্ব''।

২২ See, Surendranath Dasgupta, *A History of Indian Philosophy*, Vol. I. (Cambridge University, London, Reprinted—1932), p. 220, Ch. VII.

২৩ See, Surendranath Dasgupta, *Ibid*, P.217. Ch. VII, Do.

২৪ See, Surendranath Dasgupta, *Ibid*. P. 220. Ch. VII. Do.

২৫ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১৬। দ্বিতীয় খণ্ড, তৃতীয় পরিচ্ছেদ। গণপতি: ''সাংখ্য-দর্শনের উৎস''।

২৬ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯৯। দ্বিতীয় খণ্ড, তৃতীয় পরিচ্ছেদ, গণপতি: ''সাংখ্য দর্শনের উৎস''।

এরূপ পরিবর্তনধারায় বর্তমান সাংখ্যমতের প্রধান উদ্দেশ্য—ত্রিবিধ দুঃখনিবৃত্তি। তার উপায় 'জ্ঞান' লাভ। এ জ্ঞান প্রকৃতি-পুরুষের জ্ঞান, পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের জ্ঞান। 'সপ্ততি'-গ্রন্থে ঈশ্বরকৃষ্ণ একেই ব'লেছেন—ব্যক্ত ও অব্যক্তের জ্ঞান।[২৭] অনেকে একে জড় ও চেতনের ভেদজ্ঞান ব'লেও ব্যাখ্যা ক'রেছেন। এ জ্ঞান থেকেই—মুক্তি এবং তা-ই পরম পুরুষার্থ।

প্রকৃতি-পুরুষ-ই সাংখ্যের মূলতত্ত্ব। 'সাংখ্য কারিকা'র তৃতীয় শ্লোকে প্রকৃতিকেই বলা হ'য়েছে—মূল। তার মধ্যে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ গুণত্রয় সাম্যাবস্থায় বিদ্যমান।[২৮] সাংখ্যমতে প্রকৃতি সগুণ, কিন্তু পুরুষ নির্গুণ। 'সাংখ্য প্রবচন সূত্রে'র ৭২-তম শ্লোকে বিজ্ঞানভিক্ষু ব'লেছেন—'প্রকৃতি-পুরুষ ভিন্ন আর সব-ই অনিত্য।'[২৯] জগৎ সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রকৃতি-পুরুষের ভূমিকা কি, সে-বিষয়ে 'সাংখ্য কারিকা'র ভাষ্যে গৌড়পাদের উক্তি—"যথা স্ত্রীপুরুষ সংযোগাৎ সুতোৎপত্তিস্তথা প্রধান-পুরুষসংযোগাৎ সর্গস্যোৎপত্তিঃ।" ৪-১২।—অর্থাৎ 'স্ত্রী-পুরুষের মিলনে যেমন সন্তানের জন্ম হয় সেই রূপ 'প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগে সৃষ্টির উৎপত্তি।'[৩০] সাংখ্যমতে প্রকৃতি প্রধান, পুরুষ অপ্রধান। 'গৌড়পাদ ভাষ্যা'নুসারে—'প্রকৃতি অন্ধ এবং পুরুষ খঞ্জ; উভয়ের মিলনেই সৃষ্টি।'[৩১]

সাংখ্যকার ব'লেছেন—প্রকৃতির দু'টি রূপ—ব্যক্ত ও অব্যক্ত। তার ব্যক্ত রূপ-ই প্রতীয়মান জগৎ।[৩২] কপিল বলেন—পুরুষও অভিন্ন নয়—স্থূল ও সূক্ষ্ম ছাড়াও সাধারণতঃ শরীর ভেদে নানা পুরুষ নানা আত্মা।[৩৩] 'তত্ত্বসমাস সূত্র' ও 'সাংখ্যতত্ত্ব বিবেচনে' দেহে পঞ্চ বায়ু—প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান প্রভৃতির উল্লেখ বিধৃত।[৩৪] একে পঞ্চপ্রাণও বলে। তাছাড়া আছে—তিন রকম দুঃখ থেকে তিন প্রকার মুক্তি, নবধা তুষ্টি ও আট রকম সিদ্ধি। যোগের সঙ্গে এগুলোর সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ।

বস্তুতঃ আদি সাংখ্য চেয়েছে, আদি যোগ-তন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ ক'রতে এবং যোগের নিয়মগুলোকে ব্যাখ্যা ক'রতে। সেজন্য, সাংখ্যে—তন্ত্রের 'প্রকৃতি', মূল জগৎকারণ ব'লে ঘোষিত এবং দেহস্থ পঁচিশ তত্ত্বই সিদ্ধিলাভের উপায় স্বরূপ নির্দেশিত।

---

২৭ দ্রষ্টব্য: অজ্ঞাত-সম্পাদিত, তত্ত্ব সমাস সূত্রম্, (নামপত্র ছিন্ন), পৃ. ৯১। "সাংখ্যে মুক্তি ও মুক্তির কারণ।"

২৮ ঈশ্বর কৃষ্ণাচার্য, পঞ্চানন তর্করত্ন--সম্পাদিত, সাংখ্য দর্শনম্ (নটবর চক্রবর্তী-প্রকাশিত, দ্বি. সং., কলি. ---১৩১৬), পৃ. ১৭-১৮। কারিকা ৩ এবং তার বাচস্পতি মিশ্রকৃত টীকা: তত্ত্বকৌমুদী"।

২৯ কালীবর বেদান্তবাগীশ, সাঙ্খ্য-দর্শন (হরিপদ ভট্টাচার্য-প্রকাশিত, চতুর্থ সংস্করণ, কলি. ১৩১৭)। দ্বিতীয় অংশ, পৃ. ৮৪। প. অ. শ্লোক-৭২।

৩০ দ্রষ্টব্য: উদ্ধৃত ও অনূদিত, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯২-৯৩। দ্বিতীয় খণ্ড, গণপতি: ঐ।

৩১ See. Radhakrishnan, *Indian Philosophy*, Vol. II, (Unwin Brothers Limited, Eighth Impression, London—1958), P. 288, Ch. IV ,"The Samkha System."

৩২ দ্রষ্টব্য: গোপালচন্দ্র সেন, দর্শন পরিচয়, (রামচন্দ্র সেন-প্রকাশিত, কলি.---১৩৪৬), পৃ. ১৫। "সাংখ্য দর্শন"---অধ্যায়।

৩৩ দ্রষ্টব্য: ক. Radhakrishnan, *Ibid*, P. 282. Ch. IV, "The Samkha System."

খ. দুর্গাদাস লাহিড়ী, পৃথিবীর ইতিহাস, প্র. খ., ভারতবর্ষ (পৃথিবীর ইতিহাস কার্যালয়-প্রকাশিত, হাওড়া ১৩১৬), পৃ. ৯৫। অষ্টম পরিচ্ছেদ। "সাংখ্যদর্শন"।

৩৪ দ্রষ্টব্য: অজ্ঞাত-সম্পাদিত তত্ত্বসমাস সূত্রম্, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৯। সূত্র-১০ এবং পাদটীকা-১।

সাংখ্যের ন্যায়, আদি 'যোগ' ও বর্তমান 'যোগ'ও এক নয়। 'যোগমত'কে মহর্ষি পতঞ্জলি প্রথম সূত্রবদ্ধ করেন। তাঁর 'যোগসূত্র' মূলতঃ সাংখ্যের ত্রিবিধ দুঃখ ও পঁচিশ-তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু পতঞ্জলি তাছাড়া 'ঈশ্বর'-রূপ এক অতিরিক্ত তত্ত্ব স্বীকার করায়—একে 'সেশ্বর-সাংখ্য'ও বলে।[৩৫]

'যোগমত'-অনুযায়ীও দুঃখনিবৃত্তিই পরম পুরুষার্থ। তার জন্য প্রকৃতি-পুরুষের ভেদজ্ঞান আবশ্যক। যোগমতানুসারে পুরুষ বহু নয়—এক। সেই পরম-পুরুষ-ই ঈশ্বর রূপ 'তত্ত্ব'-বিশেষ। 'পতঞ্জল-দর্শনে'র 'ব্যাসভাষ্যে' তাঁকে 'পুরুষ-বিশেষ' বা প্রধান-পুরুষ বলা হ'য়েছে। পতঞ্জলির মতে শুধু তত্ত্ব-পরিচয় থেকেই 'ভেদজ্ঞান' জন্মে না। সেজন্য 'যোগ' অবলম্বন করা আবশ্যক।[৩৬] তাঁর মতে "যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ"।—'চিত্তবৃত্তি নিরোধ-ই যোগ।' কিন্তু পতঞ্জল-দর্শনের 'ভোজবৃত্তি'তে 'প্রকৃতি-পুরুষে'র ভেদজ্ঞানকে 'যোগ' বলা হ'য়েছে (পুং প্রকৃত্যাবিয়োগোঽপি যোগ ইত্যুদিতো ময়া)। আবার পুরাণে যাজ্ঞবল্ক্যের উক্তি—'জীবাত্মা ও পরমাত্মার সংযোগের নাম-ই যোগ।' (সংযোগাযোগ ইত্যুক্তো জীবাত্মাপরমাত্ম নোঃ)। যোগশাস্ত্রের ও যোগমতের বিকাশ লক্ষ্য ক'রলে, শুধু 'যোগ'-শব্দের ব্যাখ্যা ভেদ নয়, যোগ-সাধনার প্রকার ভেদও দৃষ্ট হয়।

যোগের আটটি সাধনাঙ্গ যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার প্রভৃতি পাঁচটি বহিরঙ্গ এবং ধারণা, ধ্যান ও সমাধি প্রভৃতি তিনটি অন্তরঙ্গ।[৩৭] কিন্তু যোগ আদিতে অষ্টাঙ্গিক ছিল না। 'মৈত্রায়নী' উপনিষদে যোগের ছ'টি অঙ্গের উল্লেখ বিদ্যমান।—'প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা, তর্ক ও সমাধি।[৩৮] যোগমতে এসবের সাধনায় সিদ্ধ সাধক বিভূতিসম্পন্ন হন এবং মুক্তি ও কৈবল্য লাভ করেন।

'যোগতত্ত্ব'-উপনিষদ অনুসারে—যোগ চার প্রকার; মন্ত্রযোগ, লয়যোগ, হঠযোগ ও রাজযোগ। এ গুলোর মধ্যে হঠযোগের প্রভাব, বিভিন্ন তান্ত্রিক, বাউল প্রভৃতি উপধর্মে প্রধান।[৩৯]

বস্তুতঃ যোগ ও তন্ত্রের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। কেননা, আদিতে এ ত্রিমত-ই পরস্পর সংযুক্ত ছিল। তাই, সাংখ্য ও যোগ যেমন পুরুষ-প্রকৃতি-নির্ভর; তেমনি তন্ত্রমতেও এ জগৎ 'প্রকৃতি'-জাত বা 'বামোদ্ভব'। তন্ত্রানুসারেও প্রকৃতি-পুরুষের মৈথুন থেকে বিশ্বের উৎপত্তি। 'সর্বোল্লাস'-তন্ত্রের একটি প্রচীন শ্লোকে বলা হ'য়েছে—"স্ত্রীয়োঃ দেবঃ স্ত্রীয়োঃ প্রাণাঃ"।—'নারীই দেবতা, নারীই প্রাণসত্ত্বা।'[৪০] তাই 'আচার ভেদ'-তন্ত্রের নির্দেশ—"বামা ভূত্বা যজেৎ পরাম।"—'নারী রূপে পরাশক্তির পূজা ক'রবে।

---

৩৫ দ্রষ্টব্য: ক. গোপালচন্দ্র সেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮। "পতঞ্জল-দর্শন"—অধ্যায়।
খ. Surendranath Dasgupta, *Ibid.*, P. 259. Ch. Vii.

৩৬ দ্রষ্টব্য: গোপালচন্দ্র সেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১ ও ৩৪। "পতঞ্জল-দর্শন"---অধ্যায়,

৩৭ দ্রষ্টব্য: ক. দুর্গাদাস লাহিড়ী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১১। একাদশ পরিচ্ছেদ, "পতঞ্জল-দর্শন"।

খ. S. N. Dasgupta, Yoga Philosophy. (Motilal Banarjee-dass. Delhi,—1974), PP 333—347. Ch. XI, "The Yoga Practice" বিবরণ ঈষৎ ভিন্ন।

৩৮ See, S. N. Dasgupta, Y. P., *Ibid*, p. 65. Ch. II, "Yoga And Patanjali."

৩৯ আহ্‌মদ শরীফ, স্ব. অ, পূর্বোক্ত পৃ. ১১৩ "বাংলার ধর্ম", শেষ অনুচ্ছেদ।

80 Quoted by, Sir John Woodroffe, *Shakti And Shakta*, (Gonesh & Co., 2nd Ed. Madras—1920), P. 96. Ch. IV, "Shakti, And Shakta",

এ প্রসঙ্গে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের ধারণা—"তন্ত্রসাধনা আদিতে নারীদেরই সাধন পদ্ধতি ছিলো, নারীভাবে সাধনার চেষ্টাটা তারই স্মারক।"[৪১] শুধু তাই নয়, আদি তন্ত্রধর্মে গুরুর আসন পুরুষের ছিল না; নারীই ছিল তার অধিকারী। তাই 'সমস্ত শাস্ত্রের মধ্যে একমাত্র তন্ত্র অনুসারে মেয়েদের পক্ষে গুরু হওয়া সম্ভব। এমন কি তাদের কাছে দীক্ষা নেওয়াই উত্তম।'[৪২] নারীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ক'রতে 'শক্তি-সঙ্গম'-তন্ত্রে বলা হ'য়েছে :

"নারী ত্রৈলোক্য জননী নারী ত্রৈলোক্য রূপিনী।
নারী ত্রিভুবনাধারা নারী দেহ স্বরূপিনী ॥
- - - - - - - - - - -
ন নারী সদৃশং বিত্তং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি।
তরুণী সুন্দরীং রম্যাং যৌবনোদ্ভূত মানসাম ॥"[৪৩]

'নিরুত্তর'-তন্ত্র নারীকে সাক্ষাৎ কালিকা রূপে ঘোষণা ক'রে ব'লেছে—"লতাদর্শন মাত্রেন কালিকাদর্শনং ভবেৎ।"[৪৪] এসব উক্তির মধ্যে আত্মা-নিরপেক্ষ' শক্তিবাদের বিকাশ লক্ষণীয়। আদিম 'প্রকৃতি'ই কালক্রমে তান্ত্রিক 'শক্তি'তে পরিণত হয়। তার নিদর্শন সিন্ধু উপত্যকার প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্যে বিদ্যমান। স্যার জন মার্শাল—হরপ্পা ও রানা ঘুণ্ডাইয়ের বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত কোলে ও পেটে সন্তানধারী দু'রকম নারী মূর্তির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে ব'লেছেন—'ওই হোল মাতৃকা বা মহামাতৃকা এবং 'প্রকৃতি'র নমুনা—যে প্রকৃতি থেকে ক্রমশঃ 'শক্তির" উদ্ভব হ'য়েছিলো।'[৪৫]

বস্তুতঃ কৃষিপ্রধান মাতৃতান্ত্রিক সমাজে তন্ত্রের উৎপত্তি হওয়ায় 'বসুমাতা'-পরিকল্পনার সঙ্গে 'শক্তি-মতবাদে'র তাৎপর্যপূর্ণ সংযোগ বিদ্যমান। কেননা, কৃষকের নিকট অকর্ষিত ভূমির যেমন গুরুত্ব, তন্ত্রোপাসকের নিকট, কুমারী নারীর গুরুত্বও তদ্রূপ। তাই বৃহন্নীল তন্ত্রের বক্তব্য—"কুমারী যোগিনী সাক্ষাৎ, কুমারী সর্বদেবতা।"[৪৬] 'যোগিনীতন্ত্রে' শিবোক্তি—"আমি কোটি সহস্র জিহ্বা ও মুখ দ্বারাও কুমারী পূজার ফল বর্ণনা করিতে অক্ষম। ---একটি কুমারীর পূজা করিলে সর্ব দেবদেবীর পূজা হয়।"[৪৭] অনুরূপভাবে 'তন্ত্রসার'-এও বলা হ'য়েছে—"কুমারী পূজা দ্বারা কোটিগুণ ফল লাভ হয়। ---নাথ। আমিই কুমারী, তুমিও কুমারী, অর্থাৎ সমস্ত কুমারীই তোমার ও

---

৪১ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫৫। দ্বিতীয় খণ্ড, গণপতি: "তান্ত্রিক ধ্যানধারণার নারী প্রাধান্য"।

৪২ দ্রষ্টব্য: ক. Sir John Woodreffe, *Ibid*, P. 99. Ch. IV. "Shakti And Shakta."

খ. উদ্ধৃত ও অনূদিত, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, দ্বি. খ., পৃ. ৩৫১। স্যার আর্থার অ্যাভেলন কর্তৃক উদ্ধৃত এইচ, এইচ, উইলসনের উক্তি।

৪৩ উদ্ধৃত, উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫৪--৫৫। পঞ্চম অধ্যায় "হিন্দুতন্ত্রে প্রকৃতি মিলন"।

৪৪ উদ্ধৃত, উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত পৃ. ৪৫৫। প. অ., ঐ।

৪৫ উদ্ধৃত ও অনূদিত, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮১। দ্বিতীয় খণ্ড, গণপতি: "গ্রামদেবতা ও মোহেনজোদারোর বসুমাতা"।

৪৬ উদ্ধৃত, উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫৫। প. অ., ঐ।

৪৭ কালীমোহন ভট্টাচার্য-সম্পাদিত, যোগিনীতন্ত্রম্ (তারাচাঁদ দাস-প্রকাশিত, ৪র্থ সং., কলি,--১৩৩৩), পৃ. ২১০-'১১। সপ্তদশ পটল, শ্লোক ২৯ ও ৩৩।

আমার অংশ। ---কুমারীই সাক্ষাৎ যোগিনী, কুমারী সাক্ষাৎ পরম দেবতা।"৪৮ এমন কি 'শ্যামারহস্য'-ধৃত অভিমত অনুযায়ীও —"শক্তিই শিব, শিবই শক্তি এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, রবি, চন্দ্র, গ্রহ এই সকলই শক্তিস্বরূপ, অধিক কি, সমগ্র জগৎই শক্তিস্বরূপ।"৪৯

এরূপে তন্ত্রমতে, 'শক্তি' থেকে উৎপন্ন ও 'শক্তি'তে প্রতিষ্ঠিত জগতে মুক্তিলাভের নিমিত্ত 'শক্তি'র সহায়তা অপরিহার্য। তন্ত্রোপাসনা তাই শক্তি-উপাসনা বা শক্তি-পূজা ব্যতীত কিছু নয়। চিন্তাহরণ চক্রবর্তী আধুনিক তন্ত্রোপাসনার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা ক'রতে গিয়ে ব'লেছেন—এ সাধনার বিশেষত্ব "মূলমন্ত্র, বীজমন্ত্র, মুদ্রা, আসন, ন্যাস, দেবতার প্রতীক স্বরূপ বর্ণ-রেখাত্মক যন্ত্র, পূজায় মৎস্য, মাংস, মদ্য, মুদ্রা, মৈথুন—এই পঞ্চ ম-কারের ব্যবহার, কার্য্যে সিদ্ধিলাভের জন্য মারণ, উচাটন, বশীকরণ, প্রভৃতি ষট্‌কর্মের আশ্রয় গ্রহণ এবং যোগানুষ্ঠান।"৫০ তন্ত্রাচার ও সাধনার আরও অনেক৫১ আচার ও ক্রিয়ার মধ্যে—মন্ত্রদীক্ষা, শক্তি বা কুলনায়িকা নির্বাচন, পুরশ্চরণ, শক্তি-পূজা, পঞ্চতত্ত্ব ও পঞ্চদ্রব্য দ্বারা অর্ঘ্য স্থাপন এবং মৈথুন বা যোগানুষ্ঠান সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

তন্ত্রে গুরু, নারী ও আদ্যাশক্তি অভিন্ন তাৎপর্যে গ্রথিত হওয়ায়,৫২ 'গান্ধর্ব'-তন্ত্রে 'গুরু-শিষ্যে' এবং 'জীব-ব্রহ্মে' অভেদ চিন্তা ক'রে ধ্যান ক'রতে বলা হ'য়েছে। এমন কি 'কালী-তন্ত্রে', 'কুব্জিকাতন্ত্রে' এবং অনুরূপ অন্যান্য তন্ত্রেও সাধককে আদ্যাশক্তির সঙ্গে অভিন্ন ভেবে ধ্যানের নির্দেশ বিধৃত।৫৩

'তন্ত্র-সার'-এ শক্তিপূজার ক্রিয়াদি সম্পর্কে বলা হ'য়েছে—'বলপূর্বক বা যত্নপূর্বক আনীত কামিনীকে মন্ত্র ও জলদ্বারা অভিষেকের পর শোধনের নিমিত্ত তার কর্ণে মায়াবীজ প্রদান করা আবশ্যক। তারপর অর্ঘ্যপাত্র স্থাপনান্তে পূর্ব-শোধিত দ্রব্য নিক্ষেপের পর কুণ্ড দ্রব্য, গোলদ্রব্য এবং স্বয়ম্ভূ কুসুম নিক্ষেপ ক'রে দেবীকে অর্ঘ্য দান করা কর্তব্য। তারপর মণ্ডূক পূজা প্রভৃতি অন্তে পর্যঙ্কোপরি কুলস্থাপন পূর্বক শক্তির অঙ্গে পঞ্চকামের পূজা করণীয়। আলোচ্য ক্রিয়া সমাপ্তির পর, সাধককে কুলনায়ক পূজা ও বটুক-ভৈরবাদির পূজা শেষে শক্তির ললাটে যন্ত্র অঙ্কন করা প্রয়োজন। অতঃপর মহাপ্রেতাসন পূজা, বালা ও কামেশ্বরীর পূজা বা (মতান্তরে) কামকলা ও সোমকলার পূজা শেষ ক'রে, শক্তির মদনাগার এবং সেখানে নিজের ইষ্টদেবতা পূজা, স্ব-লিঙ্গ পূজা প্রভৃতি অন্তে শক্তিকে তাম্বুলদান বিধি। অবশেষে শক্তির অনুমতি সাপেক্ষে

---

৪৮ কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ, তন্ত্রসার, (নামপত্র ছিন্ন), পৃ. ২২৯-২৩০। শ্লোক ৫৭ ও ৬১।

৪৯ পূর্ণানন্দ পরমহংস, শ্যামারহস্যম্ (উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত ও বসুমতী-যন্ত্রে পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মুদ্রিত এবং প্রকাশিত, কলি. ১৩১৯) পৃ. ২১৯। শ্লোক ৫০।

৫০ চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭২

৫১ See. Arthur Avalon. *Principles o Tantra*, Part I. (Luzac & Co. London—1914) P. LXii—LXiii, Introduction.

৫২ দ্রষ্টব্য : ক. কালীমোহন ভট্টাচার্য-সম্পাদিত, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫---৬। শ্লোক ২৩ ও ২৮ এবং

খ. কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫ এবং ২। শ্লোক ৫৫ ও ৮৮।

৫৩ See. Sir John Woodroffe, *Ibid.* P. 303, Ch. XIII, "Shakta Shadhana."

ক্রমে 'গজতুণ্ডমুদ্রা' দ্বারা কুলাগারে নিজ 'শিব' নিক্ষেপান্তে শক্তি-সঙ্গত হবার পর ইষ্টমন্ত্র জপ করণীয়'।[৫৪]

তন্ত্রমতে, এরূপ শিব-শক্তি যোগের নামই যোগ। জ্ঞানার্ণবে বলা হ'য়েছে—"এই স্থলে শীৎকারই মন্ত্রজপ; বাক্যই স্তব; আলিঙ্গনই কস্তুরী, চুম্বনই কর্পূর; নখক্ষত, দন্তক্ষত প্রভৃতিই বহুবিধ পুষ্প, মথনই তর্পণ, বীজপাতই বিসর্জন জানিবে। কুলার্ণবে লিখিত আছে;—আলিঙ্গন, চুম্বন, দর্শন, স্পর্শন, যোনিবিকাশ, লিঙ্গঘর্ষণ, প্রবেশ, স্থাপন এই নববিধ পুষ্প দ্বারা পূজা করিবে। যামলে লিখিত আছে, শিবশক্তি সংযোগ দ্বারা পরমানন্দময় সুখ অনুভূত হইয়া থাকে; অতএব সাধক সুদুর্লভ দিব্য কুলামৃত লইবে।"[৫৫] আলোচ্য শক্তিযোগকালে কৌলতন্ত্রমতে সাধক কুণ্ডলিনী শক্তিকে ধ্যান ক'রতে ক'রতে রমণ ও রেতক্ষরণ করেন।[৫৬] কুণ্ডলিণী-জাগরণ ষট্‌চক্রভেদ, প্রাণায়াম প্রভৃতি 'আন্তরপূজা' মন্ত্র-পুরশ্চরণ ও 'ভূতশুদ্ধি' কালে করা হয়।[৫৭]

তন্ত্রমতে এরূপ সাধনার দ্বারা সাধক শক্তির স্বরূপ অবগত হন এবং সিদ্ধি লাভ করেন। কৈবল্যদায়িণী কালীর কৃপায় তাঁর চতুর্বিংশতি তত্ত্বজ্ঞান জন্মে আর সাযুজ্য, সালোক্য, সামীপ্য, যাষ্টি প্রভৃতি চতুর্বিধ মুক্তিসহ নির্বাণ ও ব্রহ্মলাভ হয়।

উল্লেখযোগ্য যে, উপর্যুক্ত আলোচনার মধ্যে তন্ত্রধর্মের সমগ্র পরিচয় নিহিত নেই। বর্তমান তন্ত্রোপাসনার বহুবিস্তৃত বিষয়বস্তুও সম্পূর্ণরূপে এ আলোচনায় বৃত্তবদ্ধ হয়নি। এমন কি পঞ্চতত্ত্বাদির যে উচ্চতর আধুনিক ব্যাখ্যা তন্ত্রসার, মহানির্বাণতন্ত্র ইত্যাদি গ্রন্থে এবং স্যার জন. উড্রফ, আর্থার অ্যাভেলন প্রভৃতির রচনায় লক্ষণীয়, সে সবের উল্লেখও এখানে অপ্রাসঙ্গিক। পূর্বোক্ত আলোচনায় তন্ত্রোপাসনার শুধুমাত্র স্থূল লোকায়ত রূপটির বিশেষ পরিচয় তুলে ধরা হ'য়েছে; কেননা এর-ই সঙ্গে বাউল মতের বিশেষ সম্পর্ক বিদ্যমান। সেই সঙ্গে আরো দেখানো হ'য়েছে—আদিম সমাজের 'প্রকৃতি' ও 'শক্তি-পূজা' থেকে উদ্ভূত তন্ত্রোপাসনার পঞ্চতাত্ত্বিক মৌলিক অনুষ্ঠানটি আজও আশ্চর্য রকমভাবে জীবন্ত লোকায়ত চরিত্রপূর্ণ এবং এক্ষেত্রে, দেবীপ্রসাদ যেমন লক্ষ্য ক'রেছেন,—মৈথুন অনুষ্ঠানটি (তন্ত্রে) আর উৎপাদন বৃদ্ধির অঙ্গ নয়, তা' ধর্মানুষ্ঠানের অঙ্গ।[৫৮] তাছাড়া সাংখ্য-যোগ-তন্ত্র পরস্পর মূলতঃ অবিচ্ছেদ্য হওয়া সত্তেও অধুনা বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্রভাবে বিকশিত এবং নানা জটিলতা প্রাপ্ত। উক্ত ত্রিমতের বিভিন্ন রকম 'কালিক বিবর্তন, স্থানিক রূপান্তর এবং সাম্প্রদায়িক বিশেষত্ব'ও বিদ্যমান।

---

৫৪ দ্রষ্টব্য: কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ, তন্ত্রসার: পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৮-২২১। 'শক্তিশোধন'; শ্লোক ৯---২০। শক্তিপূজার আরও বিচিত্র বিবরণ জানবার জন্য দ্রষ্টব্য:

ক. পরমানন্দ ব্রহ্মচারি, শক্তি-সাধন মহাতন্ত্রম্, সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য-প্রকাশিত, পৃ. ৭৬।

খ. কৃষ্ণগোপাল ভক্ত-সম্পাদিত, মহানির্বাণ তন্ত্রম, পৃ. ১৮৪।

৫৫ উদ্ধৃত, কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২১। 'শক্তিশোধন', শ্লোক ১৮-২০।

৫৬ দ্রষ্টব্য: পূর্ণানন্দ পরমহংস, শ্যামারহস্যম্, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১০। অষ্টম পরিচ্ছেদ, 'কুলীনাচারক্রম', শ্লোক ৮।

৫৭ দ্রষ্টব্য: ক. কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৭। "আন্তর পূজা।" শ্লোক ৪৯-৫০।

খ. পরমানন্দ ব্রহ্মচারি, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪-৩৬। "ভূতশুদ্ধি"।

৫৮ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, প. ৪৩১। দ্বিতীয় খণ্ড, গণপতি: "তান্ত্রিক ধ্যানধারণার অন্যান্য কয়েকটি দিক: খপুষ্প ও পঞ্চ-মকার।"

বস্তুতঃ আদিম কৃষিজীবী অনার্য সমাজে উদ্ভূত সাংখ্য-যোগ-তন্ত্র বাঙ্‌লা তথা সর্বভারতেই অব্যাহত কৃষিজ অর্থনীতি ও তার সামাজিক প্রচ্ছায়ায় টিঁকে থেকে নানা ভাবে নিজেদের শিকড় বিস্তার ক'রে এদেশের হিন্দু-বৌদ্ধ ও ইস্‌লাম ধর্মে প্রবেশের পর বৌদ্ধ-যোগ-তন্ত্র, হিন্দু-যোগ-তন্ত্র, লৌকিক সূফী মত ও অসংখ্য লোকায়ত উপধর্মের জন্ম দিয়েছে।[৫৯] বাঙ্‌লায় আর্যধর্ম ও সংস্কৃতির অনুপ্রবেশের পর সাংখ্য-যোগ-তন্ত্রের 'পুরুষ-প্রকৃতি'বাদ এবং নর-নারীর মিথুনাত্মক যৌনসাধনা ও দেহতত্ত্বই আর্যধর্ম ও সংস্কৃতি-চিন্তায় অধিক প্রভাব বিস্তার ক'রেছে। ফলে, সমাজের নিম্নস্তরে আচরিত সমস্ত গুপ্ত ধর্মানুষ্ঠান তো বটেই, এমন কি উচ্চস্তরের জনসমাজের ধর্মতত্ত্বও সাংখ্য, যোগ এবং তন্ত্র দ্বারা প্রভাবিত না হ'য়ে পারেনি।[৬০] কাজেই বাঙ্‌লার ধর্ম ও জন-সংস্কৃতিতে এ প্রভাব কিরূপে সেই সুপ্রাচীন কাল থেকে আরম্ভ ক'রে জৈন, বৌদ্ধ হিন্দু ও ইসলামধর্মের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হ'য়ে এসে আধুনিক বাউলমতে আবর্ত রচনা ক'রেছে—এবার তা-ই অনুসন্ধেয়।

জৈনধর্ম

আর্যগণ এদেশে সর্বপ্রথম জৈনধর্ম ও সংস্কৃতিসহ প্রবেশ করেন। বাঙ্‌লা দেশের কৌম-সমাজের কাঠামো থেকে সদ্য বেরিয়ে আসা জনপদবাসীদের দ্বারা সে ধর্ম-সংস্কৃতি সাদরে গৃহীত হয়। জৈনধর্ম কত প্রাচীন তা বলা কঠিন। কারো কারো অভিমত বৌদ্ধধর্ম থেকে জৈনধর্মের উৎপত্তি। কিন্তু আধুনিক গবেষণায় জানা গিয়েছে —জৈন ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম অপেক্ষা প্রাচীন এবং শেষ জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর বুদ্ধদেবের সমসাময়িক ছিলেন।[৬১] নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন—"(বাঙ্‌লার) আদিতম আর্যধর্মই হইতেছে জৈনধর্ম এবং গুপ্তপর্বের আগেই বাঙ্‌লা দেশে বিশেষভাবে উত্তর বঙ্গে জৈন-ধর্ম বিশেষ প্রসার ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল।"[৬২] গুপ্তপর্বে অবশ্য বাঙ্‌লায় জৈনধর্ম ও সংস্কৃতির বিশেষ নিদর্শন নেই। কিন্তু সপ্তম শতকের দ্বিতীয় পাদে হিউয়েন সাং বৈশালী, পুণ্ড্রবর্ধন, সমতট ও কলিঙ্গে দিগম্বর নির্গ্রন্থ জৈনদের প্রাচুর্যের উল্লেখ ক'রেছেন। আজীবিক-নির্গ্রন্থদের পার্থক্য ধরতে না পেরে হিউয়েন সাং যদি তাঁর বিবরণে উভয় সম্প্রদায়কে মিলিয়ে জৈনদের সংখ্যাগরিষ্ঠের কথা ব'লে থাকেন,[৬৩] তথাপি একথা স্বীকার্য যে, সে সময় বাঙ্‌লায় বেশ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক জৈন বাস ক'রতেন। বাঙ্‌লা দেশের নানা স্থানে ঐ যুগের কিছু কিছু জৈন মূর্তিও পাওয়া গিয়েছে।

---

৫৯ প্রসঙ্গতঃ দ্রষ্টব্য : ক. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, জা, স, সা, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১। প্রথম অনুচ্ছেদ।

খ. নীহার রঞ্জন রায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০৫। দ্বাদশ অধ্যায়, "ধর্মকর্ম : ধ্যান-ধারণা।"

গ. আহমদ শরীফ, বা, সূ, সা, পূর্বোক্ত, পৃ. অ-আ। "বাঙ্‌লার সূফী-সাধনা ও সূফী-সাহিত্য"।

৬০ পূর্ব ভারতীয় জনসমাজে তন্ত্রের প্রভাব সম্পর্কে দ্রষ্টব্য Arthur Avalon., *Ibid*, Part I. P. XXXVIII. Introduction. পণ্ডিত যাদবেশ্বর তর্করত্নের জবাব। মধ্য অনুচ্ছেদ।

৬১ See. Surendranath Dasgupta. H. I. P., *Ibid*, P. 169. Ch. Vi. "The Jaina Philosophy."

৬২ নীহাররঞ্জন রায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১২। দ্বা. অ., ঐ, "ধর্মকর্ম : ধ্যানধারণা।"

৬৩ নীহাররঞ্জন রায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১২। দ্বাদশ অধ্যায়, ঐ, চতুর্থ অনুচ্ছেদের শেষাংশ।

জৈনমতে যোগ-ই মোক্ষলাভের উপায়। জ্ঞান, শ্রদ্ধা ও চরিত্র দ্বারাই যোগ নিষ্পন্ন হয়। অহিংসা, সুনৃত, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য, অপরিগ্রহ প্রভৃতি সমবায়েই চরিত্র। জৈনধর্মে অহিংসার উপর-ই সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হ'য়েছে।৬৪ জৈনমতে আত্মা ক্ষণিক নয়, স্থায়ী। মানবদেহ পরমাণু দ্বারা গঠিত। জড় ও চৈতন্যভেদে পরমাণু দু'রকম। জড়ের পরমাণু 'পুদ্‌গল' ও চেতনের পরমাণু 'আত্মা' নামে অভিহিত।৬৫ জৈনধর্ম ভোগ অপেক্ষা ত্যাগ, সংযম ও কঠোর-আত্মনিগ্রহের মধ্যে মোক্ষের পথ নির্দেশ ক'রেছে।

সম্ভবতঃ একারণেই বাঙ্‌লার জনজীবনে জৈনধর্ম ব্যাপক ও গভীর কোন প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়নি। পক্ষান্তরে, পরবর্তীকালে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি এদেশের জনমানসে এত দৃঢ়মূল আধিপত্য স্থাপন করে যে, তার প্রবাহে পূর্বতন জৈনধর্ম ও সংস্কৃতি উচ্ছিন্ন তো হ'য়েছেই; এমন কি পরবর্তী ব্রাহ্মণ্য এবং ইসলাম ধর্ম-সংস্কৃতিও প্রভাবিত হ'য়েছে।

বৌদ্ধযুগ

বাঙ্‌লাদেশে মৌর্য ও গুপ্ত শাসন আমল থেকেই যে, বৌদ্ধধর্মের ক্রমবিস্তৃতির সূচনা, তা' বিভিন্ন শিলালেখ ও চীনা পরিব্রাজকদের বিবরণী থেকে জানা যায়। অবশ্য এদেশে বৌদ্ধদের আগমন ও অবস্থান মৌর্যযুগ হ'তে শুরু হ'লেও এবং "গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর বাঙ্‌লা দেশে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব প্রতিপত্তি সকলের চেয়ে বেশী" ৬৬ হ'লেও প্রকৃতপক্ষে বাঙ্‌লায় খড়্গ-পাল-কম্বোজ বংশীয় নরপতিদের রাজত্বকালই 'বৌদ্ধযুগ' নামে নির্দেশ করা বিধেয়। কেননা, এ সময়ই বৌদ্ধধর্ম, রাজধর্মরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত ও সমৃদ্ধি লাভের পর বিকৃতির পঙ্কে নিমগ্ন হয়। মোটামুটি অষ্টম থেকে একাদশ শতকের মধ্যেই তা' ঘটে।

বৌদ্ধধর্ম

বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি সম্পর্কে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ব'লেছেন—"বৌদ্ধধর্ম সাংখ্যমত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, একথা অশ্বঘোষ একপ্রকার বলিয়াই গিয়াছেন। বুদ্ধদেবের গুরু আড়ার কলম, উদ্রক দু'জনেই সাংখ্য মতাবলম্বী ছিলেন।"৬৭ কিন্তু পরবর্তীকালে তন্ত্রমতই বৌদ্ধধর্মে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। অবশ্য ডঃ বিনয়তোষ ভট্টাচার্যের মতে —'বুদ্ধদেবের সময় থেকেই বৌদ্ধধর্মে তান্ত্রিকতা প্রবেশ করে। বুদ্ধদেব নিজেই সাধারণ শিষ্যদের জন্য মুদ্রা, মন্ত্র—প্রভৃতির উপদেশ দিতেন। কেননা, বুদ্ধদেবের সময় তন্ত্র-মন্ত্রের যথেষ্ট প্রচলন ও প্রভাব ছিল। নিজ সম্প্রদায়ের ব্যাপ্তির জন্য সেগুলো তিনি তাঁর ধর্মে স্থান না দিয়ে পারেননি।'৬৮ ঐতিহাসিক তথ্যানুযায়ী চতুর্থ বা পঞ্চম শতকে

---

৬৪ Surendranath Dasgupta. H. I. P. *Ibid*, P. 199., Ch. VI, Do.

৬৫ গোপালচন্দ্র সেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬২। "আর্হত বা জৈন-দর্শন।"

৬৬ নীহাররঞ্জন রায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১২। দ্বা. অ., "ধর্মকর্ম: ধ্যানধারণা।"

৬৭ উদ্ধৃত, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৮। দ্বিতীয় খণ্ড, গণপতি: "সাংখ্য-দর্শনের উৎস।"

৬৮ See. Benoytosh Bhattacharyya, *The Indian Buddhist Iconography* (Firma K. L. Mukhopadhyay, Second Edition. Reprinted. Cal. —1968), pp. 9-10. Introduction.

আবির্ভূত[৬৯] অসঙ্গ ও বসুবন্ধুই বৌদ্ধধর্মে যোগাচার মতের সংযোগ ঘটান। ফলে, মৌর্য যুগ থেকে বাঙলা দেশে সাংখ্য, যোগ-তন্ত্র মিশ্রিত যে শিথিল মহাযান বৌদ্ধধর্ম প্রবেশ করে, তা' অচিরেই স্থানীয় যোগ-তন্ত্রাচারী আজীবিক, নির্গ্রন্থ, ব্রাত্যদের অনার্য ধ্যান-ধারণা ও ব্রতানুষ্ঠানের সঙ্গে মিলন-মিশ্রণের মাধ্যমে জনপ্রিয় হ'য়ে ওঠে। আর একারণেই সপ্তম শতকে ভারতের বিভিন্ন স্থানে বৌদ্ধধর্মের অবনতি ঘটলেও বাঙলা দেশে রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় তা' উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি লাভ ক'রতে থাকে এবং তার ফলেই 'মহাযান যোগাচার বৌদ্ধধর্মের নূতন নূতন রূপ ও ধ্যান প্রত্যক্ষ করার সুযোগ ঘটে—যা' বিশেষভাবে বাঙলা দেশের সৃষ্টি'।[৭০]

বিভিন্ন যান

বাঙলায় বৌদ্ধধর্মের নানামুখী বিকাশ ঘটে। সম্ভবতঃ মহাযান বৌদ্ধধর্ম এদেশের মত ভারতের অন্য কোন অঞ্চলে এত শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত হয়নি। বিনয়তোষ ভট্টাচার্য লিখেছেন—'বুদ্ধ নিজে দু'টি যানের কথা ব'লেছেন—শ্রাবক যান ও প্রত্যেক বুদ্ধযান। শ্রাবকযানী বৌদ্ধগণ কোন বুদ্ধের মুখ থেকে ধর্মকথা শুনে পরবর্তী বুদ্ধের আগমনের পর নির্বাণ লাভ ক'রতে পারেন। আর প্রত্যেক বুদ্ধযানীরা আত্ম-চেষ্টাতেই নির্বাণলাভে সমর্থ।' কিন্তু অসঙ্গের 'মহাযান সূত্রালঙ্কার'-এ পূর্বোক্ত কথার প্রতিবাদ ক'রে বলা হ'য়েছে—শেষোক্তরা নিজেরাই শুধু নির্বাণ লাভ ক'রতে পারেন না, অন্যদেরও তা অর্জনে সহায়তা ক'রতে পারেন। 'এরূপে খ্রীস্টীয় তৃতীয় (?) শতকের মধ্যেই অসঙ্গের সময়ে তিনটি যানের উৎপত্তি ঘটে—শ্রাবক যান, প্রত্যেক বুদ্ধযান ও মহাযান। মহাযানীরা প্রথম দু'টি যানের নাম দেন—হীনযান।'

আলোচ্য তিনটি যানের পাশাপাশি চারটি দার্শনিক মতেরও সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। তা' হ'ল—'সর্বাস্তিবাদ' (সূত্রান্তিক), বাহ্যার্থভঙ্গ (বৈশেষিক), বিজ্ঞানবাদ (যোগাচার) ও শূন্যবাদ (মাধ্যমিক)।[৭১] পূর্বোক্ত তিনটি যান ও চারটি মতের কথা দ্বাদশ শতকে আবির্ভূত অদ্বয়বজ্রের 'তত্ত্বরত্নাবলী'তেও বিদ্যমান। পূর্বে আলোচিত মহাযান থেকে ক্রমে মন্ত্রযান, বজ্রযান ও কালচক্রযান প্রভৃতি বৌদ্ধতান্ত্রিক উপধর্ম সম্প্রদায়ের উৎপত্তি।

কিন্তু শশিভূষণ দাশগুপ্ত এরূপ বিভাজনকে অস্বীকার ক'রে ব'লেছেন—'বজ্রযান'কে চারটি তন্ত্রে বিভক্ত করাই সাধারণ রীতি—ক্রিয়াতন্ত্র, চর্যাতন্ত্র, যোগতন্ত্র ও অনুত্তরতন্ত্র।'[৭২] 'শ্রীচক্র-সম্বরতন্ত্র'-সম্পাদক কাজী দোশ্যামদুপ বজ্রযান থেকে ছ'টি যানের উৎপত্তির কথা ব'লেছেন। উক্ত ছ'টি যান যথাক্রমে—ক্রিয়াতন্ত্রযান, চর্যা-(উপায়) তন্ত্রযান, যোগ-তন্ত্রযান, মহাযোগতন্ত্রযান, অনুত্তর যোগতন্ত্রযান ও অতিযোগতন্ত্রযান। বিনয়তোষ ভট্টাচার্য এ বিভাজন অস্বীকার ক'রে ব'লেছেন—এগুলো বজ্রযানী সাধনার এক একটি

---

৬৯ See. J. Finigen. The Archaeology of World Religion (New Gersy. America—1952), P. 246.

৭০ নীহাররঞ্জন রায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১৭। দ্বা. অ., ঐ।

৭১ Benoytosh Bhattacharyya. *Ibid*, P. 8. Introduction. "Vajrayan Mysticism." Last Para.

৭২ See. Shashibhusan Dasgupta. *Obscure Religions Cults*. (Firma K. L. Mukhapadhyay. 3rd Ed. Cal.—1969). P. 23—24. Ch. I. "Growth of the Buddhist Shahajia Cult."

পর্যায়মাত্র।[৭৩] উল্লিখিত বিভাগ-উপবিভাগের সমষ্টিই তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম নামে খ্যাত। মন্ত্রযান এ-তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের প্রথম স্তর।

মন্ত্রযান

বৌদ্ধ মহাযান থেকেই মন্ত্রযানের উৎপত্তি। ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চি ব'লেছেন—মহা-যানের-ই কোন কোন আচার্য পরবর্তীকালে বোধিসত্ত্বলাভে—মন্ত্রশক্তির উপর বিশেষ আস্থাবান হ'য়ে পড়েন। তারা আধ্যাত্মিক দৃষ্টির বিভিন্নতার জন্য বজ্রযান, কালচক্রযান ও সহজযান নামক তিনটি শাখায় বিভক্ত। ডঃ বাগ্‌চির অভিমত—এই "তিনটিকে সাধারণভাবে মন্ত্রযান আখ্যা দেওয়া যেতে পারে।"[৭৪]

কিন্তু 'অদ্বয়বজ্রসংগ্রহে'র অন্তর্গত "তত্ত্বরত্নাবলী'তে মহাযান দু'ভাগে বিভক্ত—'পারমিতা নয়' ও 'মন্ত্র নয়'। ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের মতে—"This Mantranaya or Mantra-yāna seems to be the Introductory stage of Tantrik Buddhism from which all other offshoots like Vajra-yāna, Kalchakra-yāna, Sahaj-yāna, etc., arose later times."[৭৫] এ অভিমতই যথার্থ ব'লে স্বীকার্য। কেননা, খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় শতকে রচিত 'আর্য্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প'-গ্রন্থে মন্ত্রযানের উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু বজ্রযানের কোন প্রসঙ্গ অনুপস্থিত। অথচ পরবর্তী শতাব্দীর নিকটবর্তী কালে রচিত 'গুহ্যসমাজতন্ত্রে'ই প্রথম বজ্রযানের উল্লেখ বিদ্যমান। মন্ত্রযানীদের অন্যতম প্রাচীন গ্রন্থ 'বিদ্যাধর পিটক' খ্রীস্টীয় প্রথম বা দ্বিতীয় শতকে প্রচলিত ছিল ব'লে হিউয়েন সাং উল্লেখ ক'রেছেন। অতএব খ্রীস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর নিকটবর্তী কালেই যে, মন্ত্রযানের উৎপত্তি তাতে কোন সন্দেহ নেই।

বৌদ্ধ সাহিত্যে মন্ত্রের প্রাচীনতম রূপ 'ধারণী' সমূহ। 'ধারণী'—স্মৃতিতে সংরক্ষণ --(ধারণ) উপযোগী সংকুচিত শ্লোক। এ থেকেই ক্ষুদে মন্ত্র ও বীজ-মন্ত্র-(একাক্ষরী)-এর উদ্ভব। মন্ত্রযানীদের মতে সাধনায় সিদ্ধিলাভের জন্য এ সব মন্ত্র-সাধনা অপরিহার্য। আবৃত্তির গুণে ও কাল-প্রভাবে এসব মন্ত্র ও বিদ্যা দেহধারণ ক'রতে এবং প্রার্থিত বর দিতেও সমর্থ ব'লে তারা মনে ক'রতেন। মন্ত্রশক্তিকে এরূপ বিশ্বাস, মূলতঃ যাদু-বিশ্বাসের-ই অঙ্গ। আর তাই মন্ত্রযানীদের সমাজে ও সাধনায়, সমাজের নিম্নতম স্তরের মানুষ, বিদ্যাধর, বিদ্যাধরী, ডাকিনী, যোগিনী, প্রেতিনী, পিশাচিনী ও ভূতাদির সঙ্গে নানা লোকায়ত গুহ্য যাদুক্রিয়া ও অনুষ্ঠান প্রবেশ লাভ করে। পরবর্তীকালে এই সব আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে তন্ত্রসাধনার অনুপ্রবেশ ঘটায় সমগ্র মন্ত্রযানী ধর্মানুষ্ঠানে যৌনসাধনার প্রভাবে বজ্রসত্ত-ধারণার যে পরিবর্তন ঘটে, তা থেকেই ক্রমে ক্রমে বজ্র-যানী বৌদ্ধ ধর্মসম্প্রদায়ের উৎপত্তি।

বজ্রযান

আনুমানিক খ্রীস্টীয় তৃতীয় শতকে বজ্রযানের উল্লেখ পাওয়া গেলেও—ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে, বাঙ্‌লায় পালচন্দ্র-পর্ব—বজ্রযান বৌদ্ধধর্মের সর্বাধিক বিকাশকাল। পালরাজারা

---

৭৩ See, Benoytosh Bhattacharyya, *Sadhanamala*. Vol. II (G. O. S., 41. 2nd Ed., Reprint, Baroda—1968), PP. LXV—'Vi. Introduction "Leading Tenets of Vajrayana."

৭৪ প্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চী, বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য (ভারতী সংস্করণ, কলিকাতা), পৃ. ৬। প্রথম অধ্যায়, "বৌদ্ধ সাহিত্য"।

৭৫ Shashibhushan Dasgupta, *Ibid* P. 17. Chap. 1., *Ibid.*

সকলেই বজ্রযানী বৌদ্ধ ছিলেন। দেবপাল দেবের রাজত্বকালে উৎকীর্ণ 'ঘোষ-রাবাঁলিপি' বা 'বীরদেব প্রশস্তি' থেকে জানা যায়, বীরদেব বৌদ্ধধর্ম অবলম্বনের পর 'বজ্রাসন-বন্দনা'র অভিপ্রায়ে বুদ্ধ গয়ায় গমন করেন। তিনি দেবপাল দেবের নিকট পূজা প্রাপ্ত হন এবং নিজেও একটি বজ্রাসন-মন্দির নির্মাণ করান।[৭৬] আলোচ্য লিপির দ্বিতীয় শ্লোকে স্তুতিনিবেদনকালে, বুদ্ধদেব "শ্রীমান বজ্রাসন" নামে সম্বোধিত। অক্ষয়কুমার মৈত্র উক্ত শ্লোকের টীকায় লিখেছেন—"অবিদ্যাদি পঞ্চ-ক্লেশ-নিপীড়িত জনগণের পক্ষে বুদ্ধদেবকে সেতু রূপে গ্রহণ করাই কর্তব্য,—এই রূপ গুরুবাদমূলক মত এই শ্লোকে প্রকটিত হইয়াছে।"[৭৭] সাধনামালা'য় বজ্রযানী ধর্ম-সাধনার যে বহুতর রূপের পরিচয় পাওয়া যায়, তার মধ্যেও গুরুবাদ স্পষ্টরূপে বিদ্যমান। বজ্রযানী সাধনা তন্ত্রাচার-প্রধান বিধায় বজ্রযানীরা একান্তভাবে গুরুবাদী।

বজ্রযান, মহাযান থেকে উদ্ভূত এবং 'যোগাচার' মতের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত হওয়া সত্ত্বেও বহুবিষয়ে তাঁরা নতুন চিন্তা ও ধ্যান-ধারণার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁরা মহাযানের ত্রিকায়বাদকে চারিকায়বাদে পরিবর্তিত ক'রেছেন। মহাযান মতে—মানব-দেহ ত্রিকায় সম্পন্ন----'ধর্মকায়', 'সম্ভোগকায়' ও 'নির্মাণকায়'। বজ্রযানীরা তার সঙ্গে 'বজ্রকায়' যুক্ত ক'রেছেন। তাদের মতে 'বজ্রকায়'-ই শ্রেষ্ঠ। তা' 'বজ্রসত্ত্বে'র স্বরূপ। 'বজ্রসত্ত্বে'র পাঁচটি ধ্যানী পাঁচ প্রকার গুণের প্রতীক। এ গুণপঞ্চক বৌদ্ধ-পরিভাষায় 'পঞ্চস্কন্ধ'। তাঁদের পাঁচ জন অধিদেবতা---বৈরোচন, রত্নসম্ভব, অমিতাভ, অমোঘসিদ্ধি ও অক্ষোভ্য। তান্ত্রিক কারণে এঁদের পঞ্চশক্তি—যথাক্রমে বজ্রধাতেশ্বরী, মামকী, পাণ্ডরা, আর্যতারা বা তারা ও লোচনা। পঞ্চ ধ্যানিবুদ্ধই পঞ্চ তথাগত এবং তাঁদের পাঁচটি বোধি-সত্ত (বা পাঁচ রকম বোধিসত্তা) যথাক্রমে সমন্তভদ্র বা চক্রপাণি, রত্নপাণি, পদ্মপাণি বা অবলোকিতেশ্বর, বিশ্বপাণি ও বজ্রপাণি। এঁদের মধ্যে পূর্বোক্ত বজ্রধাতীশ্বরী, বজ্রসত্ত্বাত্মিকা, বজ্র-বারাহী, প্রজ্ঞা, প্রজ্ঞাপারমিতা ইত্যাদি নামেও অভিহিতা। তাঁর বীজ মন্ত্র 'হুং'।

বজ্রযানীরা মহাযানীদের 'শূন্য'তা-ধারণাকেও অবিকৃতভাবে গ্রহণ ক'রেননি। তাঁরা মাধ্যমিক মতানুযায়ী নাস্তি-বাচক শূন্যবাদ প্রত্যাখ্যান ক'রেছেন। তাঁদের মতে শূন্য কেবলি, ঋণাত্মক বা নেতিবাচক নয়, তার একটি ইতিবাচক তাৎপর্যও বিদ্যমান। 'যোগাচার' ও 'বিজ্ঞানবাদীদের' মতে 'নির্বাণ' লাভ ক'রলে 'শূন্যে' পৌঁছায় না, বরং একটি চিরস্থায়ী চেতনায় উপনীত হয়। পক্ষান্তরে, বজ্রযানীদের মতে সে-অবস্থায় সাধক বিশুদ্ধ আনন্দে নিমজ্জিত হয়। তাঁরা একে ব'লেছেন 'অনুত্তরসম্যকসম্বোধি।'[৭৮] 'অদ্বয়-বজ্রসংগ্রহে' তাই 'শূন্য'---দৃঢ়, সার, অচ্ছেদ্য, অভেদ্য, অদাহী, অবিনাশী, অনির্বচনীয়, 'বজ্র' বলে অভিহিত। এ'বজ্র' যাঁর সত্ত ---তিনিই 'বজ্রসত্ত'। তাঁকে 'বজ্রী'ও বলা হ'য়েছে। তিনি ভগবান, তথাগত, বুদ্ধ প্রভৃতি নামেও নির্দেশিত এবং তাঁর উপাসকগণ বজ্রী, বজ্রযানী, বজ্রাচার্য, বজ্রধর, বজ্রগুরু প্রভৃতি শব্দে বাচ্য।

বাঙ্‌লাদেশে বজ্রসত্ত বা বোধিসত্ত মতবাদের বিকাশের ফলে, পঞ্চধ্যানীবুদ্ধের অতিরিক্ত আর একটি ধ্যানী-বুদ্ধের জন্ম হয়। বিনয়তোষ বাবুর মতে—ষষ্ঠধ্যানীবুদ্ধ

---

৭৬ অক্ষয়কুমার মৈত্র, গৌড়লেখমালা, প্রথম স্তবক, (বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতি-প্রকাশিত, কলি.-১৩১৯), পৃ. ৫১-৫৩। "বীরদেব প্রশস্তি"।

৭৭ অক্ষয়কুমার মৈত্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০। ঐ, প্রথম শ্লোকের টীকা।

৭৮ See. (i) Benoytosh Battacharya. S. M. Vol. 2., LXii—iv. Introduction. "Origin and development of Vajrayana".

(ii) Benoytosh Bhattacharyya. I.B.I., *Ibid.* P.P. 10—18. Introduction.

বজ্রসত্ত্ব, বোধিসত্ত্ব বজ্রপাণি থেকে উদ্ভূত এবং বোধিসত্ত্ব বজ্রপাণির উৎপত্তি ধ্যানীবুদ্ধ অক্ষোভ্য থেকে। বজ্রসত্তের দু'টি রূপ---একক ও যুগনদ্ধ। তিনি একক রূপে—প্রকাশ্য, যুগনদ্ধ রূপে---গুপ্ত। বজ্রসত্ত দ্বিতীয় রূপে শক্তি-আলিঙ্গিত। তাঁর শক্তির নাম 'প্রজ্ঞা-পারমিতা'। উভয়ের গাঢ় আলিঙ্গিত--যুগনদ্ধ অবস্থার নাম 'যব-যুম'। এ অবস্থায় "...they turn into one Sūnya in which Karuna merges, and the duality ceases."[৭৯] অর্থাৎ বজ্রধর বা বজ্রসত্ত্ব শূন্যের প্রতীক এবং প্রজ্ঞা-পারমিতা করুণার। উভয়ের মিলিতাবস্থাই শূন্যাবস্থা। উল্লেখ্য যে, বজ্রসত্তের অপর নাম 'ধর্মধাতু'। তিনি হেরুক, হেবজ্র প্রভৃতি নামেও বিশেষিত এবং তাঁর শক্তি---বজ্রসত্ত্বাত্মিকা, বজ্রসত্তিকা, বজ্রেশ্বরী, নৈরামণি ইত্যাদি নামে চিহ্নিতা।

বজ্রযানীদের নিকট বজ্রসত্ত্ব বা বোধিসত্ত্ব---মূলতঃ শুক্রসত্ত্ব বা শুক্ররূপী আদি বুদ্ধ। তিনি 'বীজ'-রূপা। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বোধিচিত্তের স্বরূপ আলোচনাকালে লিখেছেন---''বীজ-রূপী' বোধিচিত্ত বা বজ্রসত্ত্বের স্বরূপ সম্বন্ধে নানা বৌদ্ধতন্ত্রে উল্লেখ আছে। 'হেবজ্র-তন্ত্র'-এ ভগবান হেবজ্র বলিতেছেন--'আমি উৎকৃষ্ট বজ্রনারীর যোনিতে বাস করি---("বিহরেহহং সুখাবত্যাং সদ্-বজ্রযোষিতো ভগে"। ---আমি শুক্ররূপে ঐ সুখাবতীতে বাস করি---(যোষিদ্‌ভগে সুখাবত্যাং শুক্রনাম্না ব্যবস্থিতঃ") ---এই শুক্র বিনা মহাসুখ সম্ভব নয় --- ("বিনা তেন ন সৌখ্যং ---") এই শুক্ররূপী বুদ্ধ সমস্ত ভাব ও রূপের অতীত এবং হস্ত ও মুখ-সংযুক্ত হইলেও আকারহীন মহাসুখ স্বরূপ।"[৮০] অতএব স্থূল অর্থে 'বজ্র' শব্দ শুক্র-নির্দেশক এবং বজ্রধর তিনিই---যিনি শক্তিমান বা শুক্রবান। আর তরুণী, সুন্দরী, শক্তিমতী, স্বাস্থ্যবতী নারীই---'বজ্রনারী'।

বজ্রযানীদের বোধিচিত্ত বা শূন্যতা ও করুণা---যা তাঁরা প্রজ্ঞা ও উপায় নামেও চিহ্নিত ক'রেছেন; সাংখ্যের পুরুষ-প্রকৃতির-ই অনুরূপ। তন্ত্রের শিব-শক্তির সঙ্গে তার সাদৃশ্য বর্তমান। তাছাড়া অনেকবার এদের নারী-পুরুষ রূপেও ব্যাখ্যা করা হ'য়েছে। 'হেবজ্র তন্ত্রে'র স্পষ্ট উক্তি----''যোষিৎ তাবৎ ভবেৎ প্রজ্ঞা উপায়ঃ পুরুষঃ স্মৃতঃ"---'সমস্ত নারীই প্রজ্ঞা এবং সকল পুরুষ উপায়'-কথিত। বজ্রযান-তন্ত্রে নারী---প্রজ্ঞাপারমিতার রূপ-ধারিণী; মুদ্রা, মহামুদ্রা, ভগবতী, বজ্রকায়া প্রভৃতি বিশেষণেও বিশেষিত। দার্শনিক ভাষায় উক্ত তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলা হ'য়েছে,'' প্রজ্ঞা ও উপায়ের দুইটি ধারা সংসারের স্ত্রী এবং পুরুষের মধ্যে প্রকাশিত। প্রত্যেক নারীর অন্তর্নিহিত স্বরূপ 'প্রজ্ঞা' এবং প্রত্যেক পুরুষের স্বরূপ 'উপায়'। ---বৌদ্ধ-তন্ত্রে এই প্রজ্ঞারূপিণী নারীকে 'কমল' এবং উপায়-রূপী পুরুষকে 'বজ্র' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। এই দুইটি পারিভাষিক শব্দ হিন্দুতন্ত্রের যোনি-লিঙ্গের মতো স্ত্রী ও পুরুষ জননেন্দ্রিয়ের প্রতীক-রূপে বৌদ্ধ-তন্ত্রে ব্যবহৃত হইয়াছে। 'বজ্র-কমল-সংযোগ'-এর কথা বৌদ্ধ-তন্ত্রের বহু-স্থানে আমরা পাই।"[৮১] বস্তুতঃ বজ্রযানী তান্ত্রিক সাধনার মূল লক্ষ্য---বজ্র-কমল-সংযোগ দ্বারা প্রজ্ঞা-উপায়ের মিলন ও সামরস্যজনিত মহাসুখ আস্বাদন।

---

৭৯ Benoytosh Bhattacharyya. I. B. I., *Ibid.*, P. 43, Ch. I. "Dhyani and Mortal Buddhas."

৮০ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৩-৩৪। দ্বি. অ., "বাংলায় ধর্মের ক্রম-বিবর্তনে বাউল ধর্মের উৎপত্তি ও স্থান : বজ্রযান"।

৮১ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩২। দ্বিতীয় অধ্যায়, ঐ।

কালচক্রযান

কালচক্রযান বজ্রযান থেকে নির্গত দুটি উপশাখার অন্তর্গত অন্যতম উপশাখা ব'লে মনে হয়। উক্ত উপশাখাদ্বয়—কালচক্রযান ও সহজযান। ডঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেছেন—'বজ্রযান ও কালচক্রযান তত্ত্বাংশে এক সাধনাংশেও এক।'

আনুমানিক দশম শতাব্দীর নিকটবর্তীকালে কালচক্রযানের উৎপত্তি।[৮২]

ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী লিখেছেন—'কালচক্র সম্প্রদায়ের যে সব পুঁথি পাওয়া যায় তাতে দার্শনিক আলোচনার চাইতে সাধন বিষয়ের কথাই বেশী'। এই সাধন-বিষয়ে দিন, তিথি, নক্ষত্র, যোগ প্রভৃতির বিচার একটি প্রধান স্থান অধিকার করেছিল। অভয়াকর গুপ্ত 'কালচক্রাবতার' নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। এ-গ্রন্থে "বার-তিথি-নক্ষত্র-যোগ-করণ-রাশি-ক্ষেত্রি-সংক্রান্তি প্রভৃতির বিশদ আলোচনা করা হ'য়েছে। উপরন্তু গ্রহ-নক্ষত্রকাল এমন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নির্দিষ্ট হ'য়েছে, যা হ'তেও একথা মনে করা অসংগত হবে না যে, কালচক্রপন্থী সাধক গ্রহ-নক্ষত্রের গতি অনুসারে জীবন নিয়ন্ত্রিত করবার চেষ্টা করতেন। তাদের মতে সে গতি অতিক্রম ক'রে সাধন-পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভব ছিল না। এই কারণেই হয়তো এ সম্প্রদায়কে কালচক্রযান আখ্যা দেওয়া হয়েছিল।"[৮৩] কিন্তু ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত 'শ্রীকালচক্রতন্ত্র'-গ্রন্থের ভিত্তিতে কালচক্রযানীদের মতামতের পরিচয় দিতে লিখেছেন—"In the text at our disposal the Lord has explained how the Universe with all its objects and localities are situated in the body and how time in all its diversions and sub-divisions (viz. day, night, fort-night, month, year, etc.) is within the body in the processes of the vital wind (prāna vayu). In the text Sahaja has been explained and also the details of the sexo-yogic practice for the allainment of the Sahaja. The only thing that strikes the reader is the strass laid on the central of the vital winds prāna and apāna and the results attained there by. A study of the commentary of the text (Laghu-kāla-cakra-tantra-rāj-tika, entitled Vimala-prabhā) also reveals on fundamental difference between the tenets of Vajra-yāna Buddhism those of Kāla-cakra-yāna. The strass of yoga seem however, to be the special feature, if there be any at all, of Kāl-cakra-yāna."[৮৪]

মোটের উপর, কালচক্রযানীদের মতে—শুক্রস্বরূপ বজ্রসত্ত্ব—কালচক্র। সাধনার দ্বারা এই কালচক্র শরীরে স্থির (অচল) ক'রতে পারলে সাধক সিদ্ধি লাভ করেন। সেজন্য তাঁরা তাঁদের সাধনায়—সময় ও যোগসাধনার উপর-ই বেশী গুরুত্ব আরোপ ক'রেছেন। পরবর্তীকালে কালহরণকারিণী হিসেবে আদ্যাশক্তি কালিকাদেবীর সাধনা ও পূজাও এদের মধ্যে প্রবেশ লাভ করে। সম্ভবতঃ পরবর্তী শৈব ও শাক্তমতের প্রাদুর্ভাবের মূলে কালচক্রযানীদের বিশেষ অবদান ছিল। নাথপন্থাও এদের সাধন-পদ্ধতির প্রভাব উপেক্ষা ক'রতে সমর্থ হয়নি।

---

৮২ দ্রষ্টব্য : Shashibhushan Dasgupta. ORC. *Ibid.* P. 25. Ch. I. Do. Second Para.

৮৩ প্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৬-৬৭। ষষ্ঠ অধ্যায়, "বজ্রযান ও সহজযান"।

৮৪ Shashibushan Dasgupta, ORC. *Ibid.* P. 25. Ch. I, Do.

সহজযান

বাঙ্‌লাদেশে পালরাজত্বের সর্বাপেক্ষা গৌরবময় সময়ে—আনুমানিক অষ্টম-নবম শতকে বজ্রযানীদের মধ্য থেকে সহজযানী তান্ত্রিক বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের উৎপত্তি। তখন সমাজে সামন্ত-রাজ শ্রেণীর আচরিত বজ্রযান ধর্মের রাজসিক রূপ—তার দেবদেবীদের ঐশ্বর্যময় মূর্তি-কল্পনা ও মূর্তি রচনা, সমৃদ্ধ নৈবেদ্য ও উপাচারাদি—মধ্যও নিম্নস্তরের মানুষের আর্থিক সামর্থ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না। ফলে, মধ্য ও নিম্নস্তরের জন-সমাজ থেকে ধর্মকে সহজভাবে উপলব্ধির প্রেরণা জাগে। তাঁরা সমকালীন সমাজের উচ্চশ্রেণীর আচরিত ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ক'রে শাস্ত্র, মন্ত্র ধ্যান, জপ প্রভৃতির প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন ক'রেছেন। নিন্দা ও বিদ্রূপ ক'রেছেন—ব্রাহ্মণ, ভিক্ষু, স্থবির, ক্ষপণক, একদণ্ডি, ত্রিদণ্ডি প্রভৃতি সন্ন্যাসীকে।[৮৫] তা'ছাড়া দেবদেবতা ও পূজানুষ্ঠানও তাঁদের দ্বারা বর্জিত হ'য়েছে।[৮৬] সহজযানীদের এ বিদ্রোহের জন্যই বৌদ্ধ সাহিত্যে একটি আলাদা যান হিসেবে তাঁদের কোন স্বীকৃতি নেই।

সহজযানীরা সামাজিক ক্ষেত্রে বজ্রযানীদের থেকে স্বতন্ত্র হ'লেও সাধনার পরিধিতে প্রায় অভিন্ন তত্ত্বের পরিপোষক। এজন্য বজ্রযান থেকে বিচ্যুত হওয়া সত্ত্বেও—'বজ্র-যানের তন্ত্রগুলির সাধনাংশই সহজিয়াদের প্রামানিক শাস্ত্র। এসব তন্ত্র হ'তে বৌদ্ধ সহজিয়াদের পদে ও দোহার সংস্কৃতে লিখিত টীকায় বহু উদ্ধৃতি দেখা যায়।'[৮৭] এজন্য বজ্র-গীতিকা, অর্বাচীন বৌদ্ধতন্ত্র ও দোহাকোষের মধ্যে সবিশেষ সাদৃশ্য বিদ্যমান। লক্ষ্য ক'রলে দেখা যায়, প্রথম স্তরের সহজযানী বৌদ্ধ সাধনার ধারা ক্রমপ্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এসাদৃশ্য ব্যাপক ও গভীর হ'য়ে উঠেছে এবং চর্যাপদের যুগে এসে তা' পল্লবিত আকারে প্রকাশ পেয়েছে। চর্যাপদে সিদ্ধাচার্যগণ নিজেদের সাধন-রীতি ও সাধন-তত্ত্ব অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট আকারে প্রকাশ ক'রেছেন এবং নিজেদের তান্ত্রিক বা কাপালিক, যোগী, বাজিল, বাজুল তথা বাউল প্রভৃতি নামে পরিচয় দিয়েছেন।

তাঁদের সাধনা বজ্রযানীদের-ই সাধন-ধারায় দেহবাদ-সমর্পিত। তান্ত্রিক দেহ-সাধনা অপেক্ষাকৃত স্থূল আকারে সহজযানী বৌদ্ধগণ কর্তৃক অনুসৃত হয় এবং একান্তভাবে গুরুমুখী, লোকায়ত, ভোগবাদী, রিরংসাভিত্তিক আনন্দতন্ত্রায় সাধনায় তাঁরা নিজেদের নিয়োজিত করেন। সহজযানী বৌদ্ধদের সাধন-লক্ষ্যের স্থূল-পরিচয় উড়িষ্যা-রাজ ইন্দ্র-ভূতির কন্যা লক্ষ্মীঙ্করার উক্তিতে পাওয়া যায়। 'অদ্বয়সিদ্ধি' গ্রন্থে তিনি ব'লেছেন—এ পৃথিবীতে "দেহেরই পূজা করিবে, দেহেরই ধ্যান করিবে। দেহের যাহাতে সুখ হয়, আনন্দ হয়, তাহাই করিবে। সে আনন্দের মধ্যে আবার যোষিৎ হইতে যে আনন্দ, সেই আনন্দ সর্বোৎকৃষ্ট, সেই আসল আনন্দ। যোষিৎ সম্বন্ধে জাতিবিচারের প্রয়োজন নাই। এক বা দুই যোষিতে আবদ্ধ হইয়া থাকিবারও প্রয়োজন নাই।"[৮৮] সহজিয়া

---

৮৫ দ্রষ্টব্য: হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বৌদ্ধ গান ও দোহা, (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, নতুন সংস্করণ, কলি., ---১৩৬৬), পৃ. ৮৪-৯০। "সরোজ বজ্রের দোহাকোষ"।

৮৬ See. Shashibhushan Dasgupta, *Ibid*, P. 51. Ch. III "The General Religious Outlook of the Sahajias'." The Sprit of Protest and Criticism.

৮৭ দ্রষ্টব্য: ক. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, পূর্বোক্ত, সমগ্র গ্রন্থ, চর্যাপদ, দোহাকোষ ও ডাকার্ণব।
খ. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৮। দ্বি. অ., ঐ।

৮৮ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, উদ্ধৃত, আশা দাস, বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি (কলি. ১৯৬৯), পৃ. ১৬৭।

বৌদ্ধদের মনোভাবও এরূপ-ই ছিল ব'লে অনুমিত হয়। দোহাকোষ ও চর্যাপদের সাক্ষ্য সেরূপ-ই।

বজ্রযানী ও সহজযানীদের এ ইন্দ্রিয়জ আনন্দতন্ময় মহাসুখবাদ শুধু সাধনার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, সমকালীন সাহিত্য-শিল্প ও দেব-দেবীর মূর্তি-রচনায়ও তা' প্রভাব বিস্তার ক'রেছে। উদাহরণ স্বরূপ উত্তরবঙ্গ থেকে আবিষ্কৃত একটি যুগনদ্ধ হেবজ্র-মূর্তির উল্লেখ করা যায়। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য এ-মূর্তি সম্পর্কে মন্তব্য প্রকাশ ক'রতে গিয়ে লিখেছেন---"পূর্ণ দেহমিলনের ইন্দ্রিয়জ বিপুল পুলককে একটি নৈর্ব্যক্তিক চিরন্তন আনন্দ-তন্ময়তার স্তরে কী অপূর্ব শিল্প-কৌশলে উন্নীত করা হইয়াছে। তান্ত্রিক বৌদ্ধ-ধর্মের 'মহাসুখবাদ' যে কি বস্তু, এই মূর্তিটি হইতে তাহার কিছু ধারণা করা যায়।"[৮৯]

আলোচ্য 'মহাসুখবাদ' বাঙ্‌লা দেশে শৈব ও শাক্তধর্মেরও রূপান্তর ঘটায়।[৯০] ইন্দ্রিয়জ আনন্দ-তন্ময়তা একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে বাঙ্‌লার জনসমাজে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করে, সে বিষয়ে দীনেশ চন্দ্র সেন কর্তৃক—ঐ সময়ের হরগৌরীর নানা যুগল-মূর্তি ও তাম্রশাসনাদির ভাষার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ, বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। একটি তাম্র-শাসনে বলা হ'য়েছে—"গৌরীর যুগল স্তনের প্রতি শিবের তৃতীয় নেত্রের আলো পড়াতে সলজ্জ গৌরী অবগুণ্ঠন টানিয়া বক্ষের আবরণ লইয়া ব্যস্ত হইয়াছেন. তদ্দর্শনে যে শিব মন্দ মন্দ হাসিয়া পত্নীর এই সলজ্জ ভাব উপভোগ করিতেছেন. সেই শিব আমাদের কল্যাণ করুন।" তারপর দীনেশ চন্দ্র সেনের মন্তব্য---"শিবলীলা এখানে ভাবী কৃষ্ণ-লীলার প্রতি ইঙ্গিত করিতেছে।"[৯১] এ উক্তি সত্য। কেননা, এ সময় থেকেই যোগীশ্বর শিব ক্রমশঃ অর্ধ-নারীশ্বর ও লীলায়িত হ'য়ে উঠতে থাকেন। এজন্য বলা হ'য়ে থাকে তান্ত্রিক 'মহাসুখবাদ' থেকেই ভক্তিবাদের সূচনা। ডঃ কার্‌ণ (Kern) লিখেছেন----'বৌদ্ধ ধর্ম থেকেই এদেশে ভক্তিবাদের উৎপত্তি।'[৯২] এ বক্তব্য অগ্রহণীয় নয়। কারণ পরবর্তী যুগে, পূর্বোক্ত বৌদ্ধ কায়াসাধনা ও রহস্যবাদ (Mysticism), বৈষ্ণব প্রেমসাধনা ও ভক্তিবাদের আবরণে জয়দেবের মাধ্যমে নতুন আকারে উপস্থিত, হয়। বৌদ্ধ 'যবযুম' রূপ—বৈষ্ণব যুগল-মিলনে পর্যবসিত হয়। বাহ্যপরিবর্তন এটুকু ঘটে যে, নর-নারীর নির্বিশেষ রস-সাধনা স্বীকৃতি হারায় এবং সাহিত্য ক্ষেত্রে তা' রাধা-কৃষ্ণ নামে আরোপিত ও গণ্ডীবদ্ধ হয়।

ব্রাহ্মণ্য যুগ

বাঙ্‌লা দেশে 'ব্রাহ্মণ্য যুগ' মূলতঃ অধিকতর প্রতিক্রিয়াশীল সামন্ত-অভিজাত শ্রেণীর শাসন ও শোষণের যুগ। সে-যুগ বাঙালীর পরাধীনতার যুগ, ঔপনিবেশিক যুগ। এ যুগের মর্মবস্তু সম্পর্কে উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য লিখেছেন—"পালযুগে রাজ-শক্তির আশ্রয় ও পৃষ্ঠপোষকতায় ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম পাশাপাশি প্রসার লাভ করিয়াছে; কিন্তু---পালযুগের পরে দেড়শত বৎসর বা তদূর্দ্ধকাল বাংলার ধর্মের ইতিহাস মুখ্যতঃ বেদ-পুরাণ-স্মৃতি-আশ্রয়ী ব্রাহ্মণ্যধর্মের ইতিহাস।

---

৮৯ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৭। দ্বি. অ., ঐ।

৯০ ক. দীনেশচন্দ্র সেন, বৃহৎ বঙ্গ, প্রথম খণ্ড, (ক. বি. --১৩৪১), পৃ. ৫৬৮-'৭৬। চতুর্দশ অধ্যায়, "বৌদ্ধ ও শৈবভাবের বিভিন্নতা।"

খ. নীহাররঞ্জন রায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩৪। দ্বাদশ অধ্যায়, ঐ।

৯১ দীনেশচন্দ্র সেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭০।

৯২ Dr. H. Kern, *Manual of Indian Buddhism* E. I. A, R, Vol. III, Part 8. P.133.

বৌদ্ধধর্মের স্রোত তখন ক্ষীণ, অবরুদ্ধ প্রায় হইয়া গিয়াছিল। বজ্রযান, কালচক্রযান, সহজযান প্রভৃতি কোন যানেরই অস্তিত্ব সমসাময়িক ঐতিহাসিক প্রমাণ সূত্রে বিশেষ পাওয়া যায় না। বৌদ্ধ দেব-দেবীর মূর্তিও বিরল হইয়া পড়িয়াছিল। বৌদ্ধ বিহারের দুই একটি খবর পাওয়া গেলেও তাহাদের পূর্ব গৌরব ও উজ্জ্বল্য আর ছিল না।--- পূর্বে হিন্দু ও বৌদ্ধদের মধ্যে যে সদ্ভাব ছিল---সেই সম্প্রীতির ভাব দূর হইয়া গিয়াছিল---। এমন কি, রাজশক্তির প্রতিনিধি শাসকগণ এবং পদস্থ পণ্ডিতব্যক্তিগণও যে প্রকাশ্যভাবে বৌদ্ধ বিদ্বেষ প্রচার করিয়াছেন, তাহারও প্রমাণ আছে।"৯৩ সমকালীন অবস্থা সম্পর্কে ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তও ব'লেছেন—"হাজার বৎসর পূর্বে বাংলার বৌদ্ধ রাষ্ট্রিক প্রাধান্যের যে সব প্রতিভূ ছিল তাহার কোন চিহ্ন আজ নাই। ইহা হইতেছে ভীষণ শ্রেণীসংগ্রামের একটি নির্মম দৃষ্টান্ত। দশম শতাব্দীতে এই সংগ্রাম ধর্মসংগ্রাম রূপে প্রকাশ পায়। বাংলার ছড়া---সেই সংগ্রামের স্মৃতি জাগাইয়া রাখিতেছে। এই সময়ের ইতিহাসে বৌদ্ধ দলন দেখিতে পাওয়া যায়। রাঢ় দেশের শূরেরা এবং পূর্ববঙ্গের বর্মনেরা বিদেশাগত এবং ব্রাহ্মণ্যবাদী। তাহারা বাঙ্গালীর গলায় লৌহ শৃঙ্খল পরাইতে আরম্ভ করে। পরে কর্ণাটাগত সেনেরা তাহা সম্পূর্ণ করে।--- এখন 'ধান ভানতে' 'মহীপালের গীত'-এর পরিবর্তে শিবের গীত গাওয়া হয়। বৈষ্ণব গ্রন্থে দুঃখের সহিত বলা হইয়াছে—

"যোগীপাল, ভোগীপাল, মহীপাল গীত।
ইহা শুনিতে যে লোকে আনন্দিত॥"---

এই উপায়ে বাঙ্গলার বৌদ্ধকৃষ্টির সমস্ত চিহ্নই ব্রাহ্মণেরা বিলুপ্ত বা রূপান্তরিত করিয়াছে"।৯৪ সেন-বর্মণ আমলে রাজশক্তির এ অত্যাচার মূলতঃ বর্ণবাদী প্রতিক্রিয়াশীল সামন্ত শ্রেণীর-ই অত্যাচার—তা' বৌদ্ধ জাতির উপর হিন্দু-জাতির অত্যাচার নয়।

সেজন্য সেকালে বাঙলাদেশ থেকে বৌদ্ধ সমাজ যে একেবারে বিলুপ্ত হ'য়েছিল—তা' নয়। এযুগে রাজধর্ম হিসেবে ব্রাহ্মণ্যধর্ম, বৌদ্ধধর্মকে সামন্ত সমাজ থেকে প্রায় উৎখাত করে। বৌদ্ধ সামন্ত, রাজা, পুরোহিত ও প্রতিষ্ঠাবান পণ্ডিতগণ বিতাড়িত হন। তাঁদের প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা-সংস্কৃতি ও ধর্মকেন্দ্রগুলিও বিনষ্টির হাত থেকে বিশেষ রক্ষা পায়নি। ফলে, পূর্বতন উদার বৌদ্ধ রাজা ও সামন্ত-পুরোহিত শ্রেণীর পরিবর্তে অধিকতর প্রতিক্রিয়াশীল ও অত্যাচারী ব্রাহ্মণ্যবাদী বর্ণগর্বী হিন্দু-সামন্ত-রাজ শ্রেণী, প্রতিপত্তি বিস্তার করে। তাঁদের সেবা ও প্রীতিবিধান দ্বারা তুষ্ট ক'রেই নির্যাতীত নিঃস্ব বৌদ্ধদের দেশে থাকতে হয়। তান্ত্রিক সহজিয়া বৌদ্ধধর্ম তখন কোথাও কোথাও বিলুপ্ত হয় এবং কোথাও কোথাও ব্রাহ্মণ্য ও শাক্ত-তান্ত্রিক ধারায় আত্মগোপন ক'রে হিন্দুতন্ত্রে পরিণত হয়।৯৫ লক্ষণ সেনের সভা-পণ্ডিত হলায়ুধ-লিখিত 'ব্রাহ্মণ-সর্বস্ব'-গ্রন্থ থেকে জানা যায়, তখন বারেন্দ্রী ও রাঢ়ী ব্রাহ্মণেরা সবাই তান্ত্রিক ছিলেন। বৈদিকাচার দেশে অনুসৃত হ'ত না। একই রাজসভার অপর পণ্ডিত পশুপতি-বিরচিত 'মৎস্যসূক্ত' থেকেও অনুরূপ তথ্য লাভ করা যায়। সমাজ তখন উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা হয়

৯৩ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৪-৪৫। দ্বি. অ., ঐ।

৯৪ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, সাহিত্যে প্রগতি (পূরবী পাবলিশার্স-প্রকাশিত, কলি,--১৩১৯), পৃ. আঠারো এবং একশত একাশী। "সাহিত্য ও সমাজ" এবং "বাঙ্গলা সাহিত্যে প্রগতি" দ্রষ্টব্য।

৯৫ দ্রষ্টব্য: ক. নীহাররঞ্জন রায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৪ ও ২৭৫। দ্বি. অ., ঐ।

খ. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৪ ও ২৭৫। দ্বি. অ., ঐ।

তান্ত্রিক, না হয় শাক্ত এবং নিম্নস্তরের জনসাধারণ হীনযান, সহজযান, নাথধর্ম ও অন্যান্য যোগ-তান্ত্রিক গুহ্যসাধনার পথাবলম্বী। তাঁদের সঙ্গে সমাজের উচ্চশ্রেণীর ধর্ম-সংঘাত হচ্ছে।[৯৬] এরকম সময়েই বাঙলা দেশে বখ্‌তিয়ার খিলজির আগমন ঘটে। এবং মুসলিম রাজশক্তির আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

মুসলিম আমল

খ্রীস্টীয় ত্রয়োদশ শতকের শুরু থেকে বাঙলার একাংশে মুসলিম রাজশক্তি প্রতিষ্ঠার পর এদেশে ইস্‌লাম বিস্তারে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়। কিন্তু বাঙলায় ইসলাম প্রচারে রাজশক্তি অপেক্ষা সূফী পীর-দরবেশদের কৃতিত্বই অধিক। তাঁরা বহুপূর্ব থেকেই বাঙলা দেশের উপকূলবর্তী অঞ্চলসমূহে ইসলাম বিস্তারে সচেষ্ট হন। সে প্রয়াস ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীতে বিশেষ ফলপ্রসূ হ'য়ে ওঠে। ফলে, আলোচ্য সময়ে বাঙলার সমাজ-জীবনে ও ধর্মে নতুন সংঘাত দেখা দেয়। নবাগত মুসলিম সূফী-দরবেশদের সঙ্গে স্থানীয় সাধু-সন্ত-সন্ন্যাসী-তান্ত্রিকদের ধর্মকলহ ঘটতে থাকে এবং পরাজিত এক একজন ধর্ম-গুরুর ধর্মান্তর গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বিপুল সংখ্যক শিষ্যও ধর্মান্তরিত হ'তে থাকেন।[৯৭]

ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক-এর মতানুযায়ী বাঙলায় প্রথম সুহ্‌রাওয়ার্দী তরিকার সূফীরা আসেন। তাঁর পর যথাক্রমে চীশ্‌তীয়হ্‌, কলন্দরিয়হ্‌, মদারীয়হ্‌, অদ্‌হমীয়হ্‌, নক্‌শ-বন্দীয়হ্‌ ও সর্বশেষে কাদিরীয়হ্‌ দলের আগমন ঘটে।[৯৮] এসব তরিকার মধ্যে 'মদারীয়হ্‌' ও 'কলন্দরিয়হ্‌' সূফীরাই বাঙলার আদি-মধ্যযুগের জনসমাজে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেন। রামাই পণ্ডিত-বিরচিত 'নিরঞ্জনের রুষ্মা' কবিতায় 'মদারীয়হ-দের প্রতিপত্তির আভাস পাওয়া যায়। 'মদারীয়হ্‌'-পন্থীদের সাধনায় শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ বা যোগ-সাধনার বিশেষ স্থান ছিল এবং তাঁরা যে বৌদ্ধ নাথপন্থী সাধনা অনুমোদন ক'রতেন—তা' সত্য। কবি আবদুল কাদির লিখেছেন—"শাহ্‌ মাদার সূফী আদর্শ লইয়াই এদেশের প্রচার আরম্ভ করিলেও তাঁহার দীক্ষিতেরা যে, সর্বপ্রকারে বৌদ্ধই থাকিয়া যাইতেছিল, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। মাদার দমের, - - - সাধনা প্রচার করিতেন, সেই সাধনা দ্বারাই মুক্তি প্রাপ্তির পন্থা বাৎলাইতেন। - - - সূফীধর্মে যে জিকিরের প্রচলন আছে, তাঁহার সঙ্গে - - - দমের সাধনার সামঞ্জস্য ছিল, - - - প্রথম যুগে জিকির নৃত্য-গীত বাদ্যাদি সহযোগে সম্পাদিত হইত; - - -।"[৯৯] বাঙলায় ইসলাম বিস্তারের ক্ষেত্রে সূফী-দরবেশদের এরূপ আপোষমূলক সমন্বয়বাদী বিশেষ-ভূমিকার জন্যই শাস্ত্রপন্থী ইস্‌লাম এদেশে বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জনে সক্ষম হয়নি। তাই শাস্ত্র-পন্থী আপোষহীন ইসলামের পরিবর্তে বাঙলা দেশে সূফীমতের শিথিল ইসলাম প্রচলিত হওয়ায় ডঃ মুহম্মদ এনামুল হকের ভাষায়---"বাঙ্গালার সাধারণ শ্রেণীর মুসলমানদের

---

৯৬ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, পূর্বোক্ত, পৃ. উনিশ। "সাহিত্য ও সমাজ।"

৯৭ See. Abdul Karim. Social History of the Muslims in Bengal (The Asiatic Society of Pakistan. Dacca—1959), P. 138. Ch. III Part II, "The Influence of the Sufis".

৯৮ ক. মুহম্মদ এনামুল হক, বঙ্গে সূফী প্রভাব (মোহসিন অ্যাণ্ড কোং প্রকাশিত, কলি.--১৯৩৫), পৃ. ৯৩-১১৯। চতুর্থ অধ্যায়, "বঙ্গদেশে সূফী প্রভাব প্রবেশের ধারা।"

খ. আহ্‌মদ শরীফ, সৈয়দ সুলতান---তাঁর গ্রন্থাবলী ও তাঁর যুগ, পরিচিতি খণ্ড (বা, এ, ঢাকা---১৩৭৯) পৃ. ২৩৮ ও ২৪৭; স. প., "আধ্যাত্মসাধনা ও জ্ঞান"।

৯৯ আবদুল কাদির, বাঙলার পল্লীগানে বৌদ্ধ-সাধনা ও ইসলাম, বিচিত্রা (চৈত্র, ১৩৩৫), পৃ. ৫৪৩।

মধ্যে এমন এক প্রকার নূতন ইসলাম জন্মলাভ করিল, যাহাকে "লৌকিক ইসলাম" বলিয়া নাম দেওয়া যায়। - - - ইহাতে হিন্দুধর্ম স্থান পাইয়াছে, বৌদ্ধধর্ম, জায়গা করিয়া লইয়াছে এবং আর্য, অনার্য্য ও বৈষ্ণব বিশ্বাস প্রবেশ করিয়াছে।"[১০০] ঐতিহাসিক ডঃ মমতাজুর রহমান তরফদার ব'লেছেন---'সম্ভবতঃ নাথ মতবাদীদের প্রভাবে বাঙলার সেই পর্বের মুসলমানগণ বেশী প্রভাবিত হন।'[১০১] এ ধারণা যথার্থ।

আলোচ্য পর্বে বৌদ্ধ গুরুবাদের প্রভাবে মুসলিম সমাজে পীরবাদ প্রচলিত হয়। বৌদ্ধ চৈত্য-পূজা বা স্তূপ-পূজার অনুকরণে কবর পূজা, কবরে বাতি দেওয়া, মানত ইত্যাদি এবং মঠ বা আখড়ার আদর্শে খান্‌কাহ্ নির্মাণাদির নিদর্শন থেকেও মুসলিম সমাজে বৌদ্ধ ধ্যানধারণার পরিচয় পরিস্ফুট। এমন কি নুসরৎ শাহ্ কর্তৃক 'কদম রসুল মসজিদ' নির্মাণ ---গয়ায় 'বুদ্ধপদ' ও 'বিষ্ণুপদ' পূজার সমান্তরাল ব'লে ঐতিহাসিক-গণের ধারণা।[১০২] এসবের সঙ্গে পঞ্চদশ শতকের মধ্যে[১০৩] বাঙালী মুসলমান সমাজে পাঁচপীর মতবাদের প্রচলন সেকালের মুসলমানদের উপর বৌদ্ধ মতবাদের গভীর প্রভাবের বিশেষ নিদর্শন। কেননা সেযুগে বিপুল সংখ্যক তান্ত্রিক বৌদ্ধ ইস্‌লাম গ্রহণের পর বুদ্ধাবতারদের সমাজে ও মননে স্থান না দিয়ে পারেননি। ইসলামে ধর্মান্তরিত হওয়া সত্ত্বেও অবতারবাদের প্রতি আস্থা হারাতে না পারায় এবং অলৌকিক শক্তির প্রতি আত্যন্তিক মোহের জন্য বৌদ্ধধর্মাগত মুসলমানগণ অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন পীর-দরবেশদের উপর অবতারত্ব আরোপ ক'রতে বাধ্য হন। রামাই পণ্ডিতের 'নিরঞ্জণের 'রুষ্মা'-তে তার প্রমাণ বিদ্যমান।[১০৪] এভাবেই বাঙালী মুসলমান সমাজে পীরবাদ স্থায়ী মহিমা লাভ করে।

বাঙলার আদি-মধ্যযুগের ধর্মে ও সাহিত্যে পণ্ডিতগণ বৌদ্ধ-প্রভাব নানাভাবে স্বীকার ক'রেছেন।[১০৫] বৈষ্ণব রাধাকৃষ্ণ-মতবাদের উৎপত্তি, রাধাকৃষ্ণের লীলা, মঙ্গল কাব্যের দেব-দেবী ও সৃষ্টিতত্ত্বের কাহিনী প্রভৃতিতে প্রত্যক্ষভাবে বৌদ্ধপ্রভাব দৃষ্ট হয়। 'ধর্মপূজা'বিধান, 'শূন্য-সংহিতা', 'শূন্য-পুরাণ' প্রভৃতি এ-পর্বের স্পষ্ট বৌদ্ধ-রচনা। তাছাড়া, বৌদ্ধ শূন্যবাদ, কায়াসিদ্ধি, যোগ-সাধনা এবং তার আনুষঙ্গিক ক্রিয়াদির প্রভাব 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন', 'আদ্য-পরিচয়', 'যোগ-কলন্দর',---ইত্যাদি গ্রন্থে অস্বীকার করা যায় না। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখেছেন--- "১৪০০ হইতে ১৫০০ খ্রীঃ অব্দ পর্যন্ত এদেশে বৌদ্ধধর্ম চলিতেছিল এবং অনেক কায়স্থও বৌদ্ধ ছিলেন।"[১০৬] তথাপি একালের সাহিত্যে পূর্বতন যুগের অশ্লীলতা বিশেষ স্পর্শ করেনি। সম্ভবতঃ তার

---

১০০ মুহম্মদ এনামুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৪। স অ, "বঙ্গে ভাব-মিশ্রণ ও তাহার ফল।"

১০১ See. Momtazur Rahman Tarafdar, *Husain Shahi Bengal* (Asiatic Society of Pakistan, Dacca—1965). P. 212, Ch. VI, "Islam and other Religious Systems."

১০২ See. Momtazur Rahman Tarafdar, *Ibid.*, P. 164. Ch. V., "The Religious Life."

১০৩ See. Abdul Karim. *Ibid.*, P. 168., Ch. V., "Islam as practised by the Muslims of Bengal."

১০৪ দ্রষ্টব্য : রামাই পণ্ডিত, ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত, ধর্ম্মপূজা-বিধান (ব. সা. প. কলি. —১৩২৩), পৃ. ২৬৪-৬৫। "শ্রীনিরঞ্জনের রুষ্মা।"

১০৫ দ্রষ্টব্য : আশুতোষ ভট্টাচার্য। ডঃ আশা দাসকৃত পূর্বোক্ত গ্রন্থের "পরিচায়িকা"। পৃ. চৌদ্দ।

১০৬ উদ্ধৃত, নগেন্দ্রনাথ বসু, বুদ্ধাবতার রামানন্দ ঘোষ, হরপ্রসাদ সংবর্দ্ধন-লেখমালা, প্র. খ., নরেন্দ্রনাথ লাহা ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত (ব. সা. প. প্রকাশিত, কলি,---১৩৩৮), পৃ. ২৩৯।

কারণ, আদি মধ্যযুগের সহজিয়া যৌন-উচ্ছৃঙ্খলতা নিম্নস্তরের বৌদ্ধ সমাজে গণ্ডীবদ্ধ হ'য়ে পড়ে। লিখিত সাহিত্যের সঙ্গে এ-জনসমষ্টির বিশেষ কোন সম্পর্ক না থাকায় একালের সাহিত্যে ঐ সব অধঃপতিত বৌদ্ধদের ধ্যান-ধারণারও কোন ছাপ পড়েনি। ফলে, উন্নত ধর্মবোধ ও সভ্যতার সংস্পর্শে উজ্জীবিত নবোদ্ভূত হিন্দু-মুসলিম সামন্ত-অভিজাত শ্রেণীর ধর্ম ও সাহিত্য, এ-যুগে নর-নারীর প্রত্যক্ষ যৌনাচার দ্বারা আক্রান্ত হয়নি। কিন্তু চৈতন্যোত্তরকালে উক্ত বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন ঘটে।

চৈতন্যদেব (১৪৮৬-১৫৩৩ খ্রীঃ) স্বয়ং বহু বৌদ্ধকে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত করেন। তাঁর জীবৎকালেই বৈষ্ণবধর্মে বৌদ্ধ উপাদান বিপুলভাবে অন্তর্নিবিষ্ট হয়। কেননা, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের ভাষায়---"বৌদ্ধধর্ম হইতে নব-দীক্ষিত বৈষ্ণব সমাজ যে সেই মুহূর্তেই বৈষ্ণবাচার সিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা নহে, বরং বৈষ্ণব ধর্মের নামে তাহারা প্রচ্ছন্নভাবে বৌদ্ধ আচারই পালন করিয়া যাইতে লাগিল। এইভাবে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ বৌদ্ধ উপাদানে নূতন করিয়া গঠিত হইয়াছিল।"[১০৭] এ উক্তি যথার্থ। কেননা, চৈতন্য দেব নীলাচলে অবস্থানকালে, তাঁর নিকট----অদ্বৈত আচার্যের প্রেরিত তর্জা-সংবাদের মধ্যেও চৈতন্য-সম্প্রদায়ে বৌদ্ধ আচারানুষ্ঠানের প্রাবল্যের নিদর্শন মেলে।[১০৮]

বৈষ্ণব-সহজিয়া ও ফকিরীমতের উদ্ভব

ক. বৈষ্ণব-সহজিয়া মত

চৈতন্য দেবের সাধনার দু'টি দিক---'নাম-সংকীর্তন' ও 'রস-আস্বাদন'-ই পরবর্তী-কালে 'সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব ও 'রসিক বৈষ্ণব' গোষ্ঠীর সৃষ্টি করে। এই 'রসিক-বৈষ্ণব'গণ-ই ---'সহজিয়া বৈষ্ণব' নামে খ্যাত। বৈষ্ণব রাগানুগা সাধন-পদ্ধতির সাধ্য-সাধন তত্ত্ব, যা 'প্রেম-বিলাস-বিবর্ত' নামে খ্যাত---তা-ই বৈষ্ণব সহজিয়া মতের ভিত্তি। চৈতন্য-দেব রায় রামানন্দের নিকট থেকে এতত্ত্ব লাভ করেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ আলোচ্য প্রেম-বিলাস-বিবর্তকেই 'সহজবস্তু' ব'লেছেন।[১০৯]

'চৈতন্যচরিতামৃতে' এরূপ 'সহজতত্ত্বে'র প্রকাশ্য প্রচার, সমকালীন অভিজাত সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব-মোহান্তদের প্রীতি অর্জন করেনি। ফলে, বৃন্দাবনের জীব গোস্বামী প্রভৃতি----উক্ত গ্রন্থের প্রচার নিষিদ্ধ ক'রলেও সমকালীন ও উত্তরকালের---'বাউল প্রভৃতি মরমিয়া সাধক, যাঁদের পুরোপুরি 'বৈষ্ণব' বলা চলে না এবং যারা সাধারণতঃ শাস্ত্র বিধি উপেক্ষা করে, তাঁদেরও আর্ষগ্রন্থ রূপে গৃহীত হ'য়েছিল'।[১১০] ফলে সপ্তদশ শতকে বীরভদ্রের অভ্যুদয়ের পর বৈষ্ণব ধর্মের আশ্রয়ে অবস্থিত, অবহেলিত ও

---

১০৭ আশুতোষ ভট্টাচার্য, ডঃ আশা দাশ-কৃত পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. একুশ। পরিচায়িকা।

১০৮ দ্রষ্টব্য: এস. এম. লুৎফর রহ্‌মান, বাউল শব্দের উৎপত্তি ও ব্যাখ্যা, সাহিত্য পত্রিকা, (শীত সংখ্যা---১৩৭৬), পৃ. ১১০-১১।

১০৯ দ্রষ্টব্য: কৃষ্ণদাস কবিরাজ, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও সুবোধচন্দ্র মজুমদার-সম্পাদিত, চৈতন্য চরিতামৃত, (দেব সাহিত্য কুটীর-প্রকাশিত, সংশোধিত সংস্করণ, কলি,---১৩৬১), পৃ. ১৫৩। "মধ্য লীলা", দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

১১০ দ্রষ্টব্য: সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পূর্বার্ধ, (ইস্টার্ণ পাবলিশার্স, পঞ্চম সংস্করণ, কলি,---১৯৭০) পৃ. ৩৬৩। একাদশ পরিচ্ছেদ, "চৈতন্যাবদান"।

নিপীড়িত প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধগণ 'বীরভদ্রী' নামে প্রকাশ্যে আত্মপরিচয় দিতে থাকে। এই বীরভদ্রীরাই প্রকাশ্যতঃ বৈষ্ণব সহজিয়া বাউল।

অনুসন্ধান করলে জানা যায়, বাঙ্‌লা, বিহার ও উড়িষ্যায় বৌদ্ধ জনসমাজের পুনর্জাগরণের সূত্র ধরেই বৈষ্ণব সমাজে এদের আবির্ভাব হয়। উড়িষ্যাতেই এর প্রথম সূচনা। রামাই পণ্ডিত কর্তৃক জগন্নাথ দেবের বুদ্ধাবতার-কল্পনা[১১১] পঞ্চদশ শতকে উড়িষ্যার জনসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং তা ষোল শতকে বিশেষ ভাবে প্রচারিত হয়। 'এ শতকের শেষভাগে রচিত উড়িয়া কবি ঈশ্বর দাসের 'চৈতন্যভাগবত', যশোবন্ত দাসের 'প্রেমভক্তি ব্রহ্মগীতা' ও দিবাকর দাসের 'দারুব্রহ্মগীতা'য় চৈতন্যের বুদ্ধাবতার-প্রসঙ্গ বিদ্যমান।[১১২] এদেরই অনুসরণ ক'রে সপ্তদশ শতকের শেষভাগে রাঢ়-বঙ্গের রামানন্দ ঘোষ স্বয়ং বুদ্ধাবতার দাবী করেন। তাঁর সম্পর্কে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর উক্তি—''বর্দ্ধমান জেলায় রামানন্দ ঘোষ নামক এক ব্যক্তি ঐ শতাব্দীতে আপনাকে বুদ্ধের অবতার বলিয়া পরিচয় দিয়া বৈষ্ণব ও মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে একটি অভিযান সংগঠিত করিয়াছিলেন।''[১১৩] রামানন্দের নিজের ঘোষণা ছিল—

''যবন ম্লেচ্ছর রাজ্য বলে কাড়ি লব।
একচ্ছত্র রাজ্য করি দারুব্রহ্মে দিব।''[১১৪]

কবির রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়নি। তবে তাঁর আকাঙ্খার ঐতিহাসিক মূল্য অনস্বীকার্য। এথেকে সহজেই বোঝা যায়, বাঙ্‌লা ও উড়িষ্যার হিন্দু-সমাজে সপ্তদশ শতকে বৌদ্ধ ভাব-কল্পনা পুনরায় বিশেষভাবে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ওঠে এবং ধর্মকে কেন্দ্র ক'রেই ধর্ম-বিদ্রোহের পাশাপাশি রাজনৈতিক বিদ্রোহের আকাঙ্খাও উদ্‌গত হয়।

বৌদ্ধ নবজাগরণের এই তরঙ্গাঘাত থেকে বৈষ্ণব সমাজকে রক্ষা ক'রতে গিয়েই বীরভদ্র সহজিয়া বৈষ্ণবমত প্রচার করেন এবং বিপুল সংখ্যক বৌদ্ধকে স্বমতে আনেন। বৈষ্ণব সমাজের অভ্যন্তরস্থ অবহেলিত বৌদ্ধাগত বৈষ্ণবরাও এ নতুন মতবাদের মধ্যে নিজেদের প্রাক্তন ধ্যান-কল্পনার প্রতিষ্ঠা ক'রে অসংকোচে আত্মপ্রকাশ করেন। তাঁরা বীরভদ্রকে আশ্রয় ক'রেই, চৈতন্য-প্রবর্তিত ধর্ম ও সমাজ-আদর্শচ্যুত শাস্ত্র-নির্ভর গোস্বামী-মোহান্ত-সামন্ত-অভিজাত শ্রেণীর ধর্মাচারের বিরুদ্ধে নিজেদের উদার অসাম্প্রদায়িক শাস্ত্র-ত্যাগী গুরুবাদী 'সহজধর্ম' প্রচার করেন।

খ. ফকিরী মত

মধ্যযুগে বাঙ্‌লা দেশে আগত বিভিন্ন তরিকার সূফীদের মধ্যে যে পীর-প্রথার উৎপত্তি হয়, তার-ই সমান্তরাল ধারায় ক্রমে ফকিরীমতের উদ্ভব। আদি মধ্যযুগের সমাজে প্রকাশ্য ভাবে সহজিয়া মত প্রচার লাভের সুযোগ না থাকায় এবং ব্যাপকভাবে

---

১১১ দ্রষ্টব্য: রামাই পণ্ডিত, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৮। প্রথম স্তবক।

১১২ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, বুদ্ধাবতার চৈতন্যদেব, প্রবাসী (কার্তিক-১৩৪৬), পৃ. ১২৮-২৯।

১১৩ দীনেশচন্দ্র সেন, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, (সপ্তম সংস্করণ, প্রকাশকাল অনুক্ত, কলিকাতা), পৃ. ৪৬।

১১৪ উদ্ধৃত, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৮।

নাথ মতবাদের প্রভাবে, মুসলিম কবিদের জীবনে, সাধনায় ও রচনায় যোগ-নির্ভর দেহ-তত্ত্বের প্রাদুর্ভাব ঘটে। চতুর্দশ শতকের কবি শেখ জাহিদের 'আদ্য পরিচয়'তার প্রমাণ। এই ধারা প্রায় ষোল শতক অবধি মুসলিম সমাজে অক্ষুণ্ণ ছিল। কিন্তু এই শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে বৈষ্ণব ধর্মের প্রেম-ভক্তিবাদী সাধনা দ্বারা পূর্বোক্ত বৈশিষ্ট্য ব্যাহত হয় এবং মুসলমানদের মধ্যেও বৈষ্ণব সহজিয়াদের তন্ত্র-প্রভাবিত সাধনার প্রসার লাভ ঘটে। ফলে নানা ধরণের ফকিরী মতের প্রকাশ্য আবির্ভাব সম্ভব হয়।

সাহিত্য ক্ষেত্রে ষোড়শ শতাব্দী থেকে সমকালীন বৌদ্ধ-বৈষ্ণব সহজিয়া তত্ত্বের স্পষ্ট সাদৃশ্য সৈয়দ সুলতানের রচনায় বেশ দীপ্যমান।[১১৫] এ ধারাটি ক্রমশঃ ব্যাপ্তি প্রাপ্তির পর অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আলী রাজা ওরফে কানু ফকীর, তাঁর পুত্র ও শিষ্যদের রচনায় ব্যাপক রূপে আত্মপ্রকাশ করে। মুসলিম ফকীরদের জন্য আলী রজাই প্রথম 'আগম' রচনায় উদ্বুদ্ধ হন। তাঁর 'আগম বা জ্ঞান সাগর' ও সৈয়দ সুলতানের জ্ঞান-প্রদীপের মধ্যে আশ্চর্য সাদৃশ্য বিদ্যমান। বস্তুতঃ আলী রজার সময় থেকেই মুসলিম সমাজের একাংশে যোগ-নির্ভর সাধনার পরিবর্তে তন্ত্র-সম্মত সাধনা অনুপ্রবিষ্ট হয়। অর্থাৎ হিন্দুদের মধ্যে শপ্তদশ শতাব্দীতে বৈষ্ণব সহজিয়া মতের প্রাবল্য লাভের পর প্রায় এক শতাব্দীর মধ্যে প্রকাশ্যে মুসলমান সমাজেও সহজিয়া ফকিরী মতের উৎপত্তি ঘটে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালী মুসলিম সমাজের একাংশে বাউল-ফকিরী মতের পুন-রুদ্ভব তাই আকস্মিক কোন ঘটনা নয়। তা' পূর্ব-প্রবাহিত ধারায় বাউল-ফকিরী মতেরই নতুন রূপ বিশেষ। সুবিখ্যাত লোক-কবি ও সাধক, লালন শাহ্ ফকীর-ই এই আধুনিক বাউল-ফকিরী মতের স্রষ্টা। তাঁর মতবাদের মধ্যে হিন্দু-মুসলিম সহজিয়া বাউলমতের সমীকরণ বিদ্যমান।

বাঙ্‌লা দেশের আধুনিক বাউল মতকে এই পরিপ্রেক্ষিতেই বিচার্য।

---

১১৫ দ্রষ্টব্য: আহ্‌মদ শরীফ, সৈয়দ সুলতান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৭। "সৈয়দ সুলতানের সঙ্গীত ও অধ্যাত্ম-সাধনা।"